আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী

শ্রীমতিলাল রায়

প্রবর্ত্তক পাব্লিশার্স
৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ.
প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স
৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : রাসপূর্ণিমা
কার্ত্তিক ১৩৬৪ : নভেম্বর ১৯৫৭
দাম : দুই টাকা ৭৫ নঃ পঃ

মুদ্রণ :
প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন প্রাইভেট লিঃ
৫২/৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে
শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

পূজনীয় মতিলাল রায় মহাশয়ের সঙ্গে বাঙলার স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও তৎসংশ্লিষ্ট কার্য্যাবলীর গভীর যোগ আছে, সেটি হয়ত অনেকে আভাসে জানেন। কিন্তু আজ রোগশয্যা থেকে তিনি যে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দিয়ে গেলেন, সে-জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। প্রধানতঃ স্মৃতির উপর নির্ভর করে'ই তিনি বলে' গেছেন—কারণ, 'অগ্নিযুগের' অগ্নিপরীক্ষায় 'কাগজের দলিল রক্ষা পায় না; আর রক্তমাংসের এই মরদেহটার দলিল উৎসর্গ করে' যাঁরা সংগ্রাম করে' গেছেন, তাঁদের ও অনেক 'অজানা" নাম— 'আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী' গ্রন্থে—আমরা প্রথম পেলাম।

জর্জ এণ্ডারসন (George Anderson) কোম্পানীর 'সামান্য কেরাণী' একজন স্বদেশী যুগের (১৯০০-১৯০৫) দিব্য প্রেরণায় কেমন করে' পথে বেরিয়েছিলেন, আবার শ্রীঅরবিন্দের দর্শন ও সাক্ষাৎ সংযোগের (১৯০৬-১৯১০) ফলে মতিবাবু ও তাঁর সহকর্মীদের কি পরিবর্ত্তন হ'ল, তাঁদের মধ্যে যেন এক নূতন বিপ্লব দেখা দিল; কলকাতার পুলিসের শ্যেন-দৃষ্টি এড়িয়ে' কেমন করে' শ্রীঅরবিন্দ চন্দন-নগরে মতিবাবুর গৃহেই আশ্রয় নিলেন এবং সেখান থেকেই এই বাঙলার কাছে তাঁর চিরবিদায় ও পণ্ডিচারীপ্রয়াণ—এই সব কাহিনী মাত্র নয়— ইতিহাস হয়ে' গেছে।

চন্দননগরের অমর-শহীদ বীর কানাইলাল দত্তের কারা-কাহিনী, তাঁর ফাঁসী ও বিরাট্ শোভাযাত্রা—ভারত-স্বাধীনতার যেন জয়যাত্রা হয়ে' উঠেছে মরমী মতিলালের লেখনীতে। সেই ৫০ বছর আগেকার দিনগুলি আজ আমাদের চোখে জ্বলন্ত হয়ে' উঠেছে এবং ভবিষ্য যুগের অনেক তরুণ প্রাণে প্রেরণা দেবে। তাদের অগ্রজ দল 'কর্ম্মণ্যেবাধি-কারস্তে মা ফলেষু কদাচন,' এই মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে' জীবন বলি দিয়ে'

গেছেন স্বাধীনতার জন্য : এ শুধু বাংলার নয়, সারা ভারতের তথা এশিয়ার গৌরব-গাথা। ইংরেজ-রচিত ইতিহাসে না উঠুক, রক্তের অক্ষরে বাঙালী বীরগণ সে ইতিবৃত্ত লিখে' গেছেন। তাদের ছিল এক চিন্তা, এক স্বপ্ন—বিজাতীয় শাসনশৃঙ্খল ভেঙ্গে' আনতেই হবে স্বাধীনতা—তার জন্য যে কোন উপায়ই উপায়মাত্র ; লুঠ-তরাজ, ডাকাতী, নর-হত্যাদি সবই ঘটেছে এবং অপূর্ব্ব সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে মতিবাবু সবই লিপিবদ্ধ করে' গেছেন—পড়তেও গায়ে কাঁটা দেয়।

আবার ইংরেজ-পুলিসের দেশী গোয়েন্দা ও চর-অনুচরদের কুকীর্ত্তি-দেশদ্রোহি-হত্যা, স্বদেশী দলে ভাঙ্গন—বিপ্লবীদের মধ্যে কোথাও নৈতিক অবনতি—সব যেন বিচক্ষণ 'সার্জ্জেনে'র মত মতিবাবু চিরে'-চিরে' দেখিয়েছেন—ধন্য তাঁর সত্যনিষ্ঠা!

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে হঠাৎ শ্রীঅরবিন্দ যেন এক দিব্য প্রেরণায় নির্দ্দেশ দিলেন পুরাণ 'তান্ত্রিক' সাধনা ছেড়ে' 'বেদান্তে'র সমন্বয়-পন্থা ধর—কিন্তু তখন শোনে কে?

১৯১২ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হল বটে, কিন্তু সেই বছরেই চন্দননগরের রাসবিহারী বসু বড়লাট হার্ডিঞ্জ সাহেবের উপর বোমা ফেলেন দিল্লীতে : তবু পুলিস তাঁকে তিন বছরেও ধরতে পারেনি। ১৯১৫ সালে —রবীন্দ্রনাথ জাপানে যাবেন শুনে'ই, যেন তাঁর আত্মীয়—পি-এন-টেগোর—ছদ্মনামের পাসপোর্ট ইত্যাদি নিয়ে' রাসবিহারী গেলেন জাপানে। সে সব গল্প তিনিই হাসতে-হাসতে—কবিগুরুকে ও আমাদের শুনিয়েছেন ১৯২৪ সালে যখন আমরা চীন পরিক্রমা শেষ করে' জাপান যাই। একক বাঙালী রাসবিহারী ১৯১৫ থেকে ১৯৪৫-এ নেতাজী সুভাষের মুক্তি-সংগ্রাম পর্য্যন্ত—কী বিপুল কাজ করে' গেছেন সেই ৩০ বছরে—তার খোঁজ আজও শুরু হয়নি।

১৯১০ সালে চন্দননগর থেকে গোপনে শ্রীঅরবিন্দ-বিদায় ;' সেখান

থেকেই আবার ১৯১৫ সালে, তেমনিভাবেই রাসবিহারীকেও শেষ প্রবাসে পাঠাবার কাহিনী মতিবাবু লিখেছেন গভীর বেদনার রঙে। তাঁর নিজের জীবনেও এখন থেকে যেন মোড় ফিরল। তখন থেকেই তিনি শ্রীঅরবিন্দের নির্দ্দেশে, চরিত্রবান্ তরুণদের নিয়ে' এক সাধকসঙ্ঘ গড়তে সুরু করলেন: তখনও টেগার্ট সাহেব তাঁদের চন্দননগরের আড্ডায় হানা দিয়েছেন—'বোমার কারখানা' আবিষ্কার করতে। কিন্তু ফরাসীর উদার আইন ও ফরাসী কর্ম্মচারীদের গুণে মতিবাবু ও তাঁর আশ্রিত বিপ্লবীরা অনেকে ফাঁসীকাঠ থেকে মুক্তি পান। তবে তাঁদেরও পরিবার-প্রতিপালনের কথা ভাবতে হয় এবং জীবিকা-সমস্যাও তখন দারুণ। তাই প্রথম দেখা দিল 'চেয়ার' তৈরীর কারখানা ও দেশ-প্রসিদ্ধ "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের" অর্থপ্রতিষ্ঠান। এইভাবে বোমার কারখানা কেমন করে' মানুষ-গড়ার কারখানা হয়ে' উঠল ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ থেকে মহাত্মা গান্ধি প্রভৃতি কত মহাজন এখানে এসেছেন, সে'ত আমাদের স্বচক্ষে দেখা। প্রবর্ত্তকের মেলা, প্রদর্শনী, নবশিক্ষাপদ্ধতি, সমবায়, লাভহীন নয় কিন্তু লোভহীন ব্যবসার ভিত্তিপত্তন—এই সবই দেশের লোক আজ জানেন।

কিন্তু জাতীয় গঠনের এ বহুমুখী প্রেরণা ও প্রচেষ্টা সঙ্ঘগুরুর কাছ থেকে তাঁর শিষ্য ও শিষ্যারা কী কঠিন মূল্যে পেয়েছেন, তারই যেন আভাষ মতিবাবু "আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী"তে রেখে' গেলেন।

তাই কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আমরা চাই তাঁর আশু রোগমুক্তি। চাই বাংলা তথা বাঙালীর—আজ এক দারুণ সঙ্কটে—তাঁর প্রেরণা ও আশীর্ব্বাদ।

মহালয়া

১৩৬৪ **(ডক্টর) শ্রীকালিদাস নাগ**

আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী

গ্রন্থকারের অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থ :

জীবনসঙ্গিনী ৫৲

বেদান্ত দর্শন ৭৲

শ্রীমদ্ভগবতগীতা (প্রথম খণ্ড) ৫৲

উপাসনা মন্দিরে ১ম ২৲ ২য় ২৲

লীলা ।৵৹ নারীমঙ্গল ।৵৹

সাধনা ॥৵৹ সঙ্ঘজীবন ১।৹

পৃষ্ঠভূমি

বাংলার বৈপ্লবিক ইতিহাস মহারাষ্ট্রের সহিত কিছুটা সংজড়িত। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে হিন্দু ও মুসলমানের প্রচণ্ড বিরোধের ফলে পুণার চিৎপাবন ব্রাহ্মণদের মধ্যে হিন্দু-সংস্কৃতি-রক্ষার দায়িত্ব গুরুতর আকৃতি ধারণ করে। পুণায "গণপতি-উৎসব" ইহার পূর্ব্বে পারিবারিক উৎসব-রূপে অনুষ্ঠিত হইতেছিল; কিন্তু এই সময় হইতে উহা সার্ব্বজনীন সাধারণ উৎসব-রূপে পরিণত হয়। এই উৎসবের মূলে রাষ্ট্র-স্বাধীনতার অনুপ্রেরণা নিহিত করেন—বালকৃষ্ণ চাপেকার ও বিনায়ক দামোদর সাভারকার নামে দুইজন চিৎপাবন ব্রাহ্মণ। "গণপতি-উৎসবে" হিন্দুদের উৎসাহ প্রবল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। তারপর লোকমান্য তিলক ও দেশ-নায়ক পরাঞ্জপের উদ্যোগে সার্ব্বজনীন "গণপতি-উৎসবের" সহিত "শিবাজী উৎসব" সমস্ত দক্ষিণাপথে প্রবর্ত্তিত হয়। স্বাধীনতার বহ্নি তখনও ধূমাচ্ছন্ন ছিল; কিন্তু ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে প্লেগ উপলক্ষ করিয়া দুইজন ইংরাজ কর্ম্মচারীকে নিহত করা হয়। তাহার পর হইতেই পুণার প্রাণশক্তি শনৈঃ-শনৈঃ স্বাধীনতার বীর্য্য চতুর্দ্দিকে ছড়াইতে থাকে এবং বাংলা-দেশেও এই প্রেরণা আসিয়া পৌঁছায়। বাংলার তরুণেরাও এই সময় হইতে পরাধীনতার শৃঙ্খল টুটাইবার জন্য গভীর ষড়যন্ত্রে সংহতিবদ্ধ হইতে থাকে। পুণার অগ্নিশিখা বরোদার শ্রীঅরবিন্দকে স্পর্শ করে। ইতঃপূর্ব্বে তিনি ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষায় যোগ না দিয়া, গায়েকোয়ার মহারাজের আহ্বানে ভারতে ফিরিয়া বরোদা কলেজে অধ্যাপনা-রত ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষও তখন বরোদায় তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের অনুপ্রেরণা লইয়া বারীন্দ্র ১৯০২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় উপস্থিত হন এবং "ভবানীমন্দিরের" স্বপ্ন

বুকে লইয়া বিপ্লব-কেন্দ্র-সংস্থাপনের প্রয়াসী হন। কিন্তু তিনি এখানে বিপ্লবের অনুকূল অবস্থা আবিস্কার করিতে অসমর্থ হইয়া পুনরায় বরোদায় ফিরিয়া যান। তাঁহার বুকে যে অনলাকাঙ্খা জ্বলিয়াছিল, তাহাতে অতিষ্ঠ হইয়াই তিনি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বাংলায় পুনরায় ফিরিয়া আসেন। তাঁর অদম্য প্রচেষ্টায় বাংলার এক শ্রেণীর মনীষী মুক্তি-কামনায় তাঁহার কর্ম্মে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দেন। বাঙ্গালী তরুণদের মধ্যে এই সময়ে ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র—উভয় বিষয়ে উত্তেজনা পরি-লক্ষিত হয়। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে আচার্য্য বিবেকানন্দের তিরোধানে বাংলার তরুণেরা গীতার ধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ হইয়া দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় সংহতিবদ্ধ হইতে থাকে। আর অন্য দিকে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে শিবের বিষাণ শুনিয়া একদল মানুষ রাষ্ট্রসাধনায় প্রবৃত্ত হয়। বারীন্দ্রকুমার এই সুযোগে গীতার আশ্রয়ে বৈপ্লবিক রাষ্ট্রসংহতি-গঠনে আনুকূল্য লাভ করেন। তারপর ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গে দেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। বাঙ্গালী জাতির দেশাত্মচেতনা উদ্বুদ্ধ হয় সুরেন্দ্রনাথের অগ্নিগর্ভ বক্তৃতায়। তিনি বাংলায় জাতীয়তার প্রবল বন্যা প্রবাহিত করেন। সে জলতরঙ্গে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের অসংখ্য নরনারী অভিষিক্ত হয়।

৭ই আগষ্ট ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের সঙ্কল্প ঘোষণা করেন। তাহার প্রতিবাদে কলিকাতার "টাউন-হলে" মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর পৌরোহিত্যে এক বিরাট্ সভার আয়োজন হয়। এই সভায় সুরেন্দ্রনাথ বাংলার ভাবী নেতৃগণের সহিত অসংখ্য তরুণ স্বেচ্ছাসেবক লইয়া নগ্নপদে সভাক্ষেত্রে উপস্থিত হন। বাংলার সুপ্ত চৈতন্যের জাগরণ-লক্ষণ কি অপূর্ব্ব উৎসাহ সৃজন করিয়াছিল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত হইবে না। সুরেন্দ্রনাথের অনুসরণ করিয়াই নূতন বাংলা রাষ্ট্রমুক্তির পথে এইদিন হইতেই চলিতে সুরু করিল। বারীন্দ্রকুমার

অলক্ষ্যে তাঁহার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা সফল করার জন্য লোক-সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন। যে সকল প্রসিদ্ধ পুরুষ সে যুগে বিপ্লব-প্রচেষ্টায় অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার প্রমথ মিত্রের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলার বিপ্লবযুগের ইতিহাসের বুকে তাঁহার নাম চিরাঙ্কিত থাকিবে।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৩০ শে অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্য্যে পরিণত হইল। সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ মিলিত হইয়া এই দিন "রাখীবন্ধনোৎসব" ঘোষণা করিলেন। "ভাই-ভাই এক ঠাই, ভেদ নাই, ভেদ নাই" বলিয়া অখণ্ড বঙ্গের ঘরে-ঘরে মহারোল উঠিল। দীপালী-সজ্জায় প্রাসাদ হইতে পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত আলোকিত হইল৷ রাষ্ট্রকর্ত্তৃপক্ষগণ প্রমাদ গণিলেন। ভীরু বাঙ্গালী জাতির বিদেশী শাসক-দের কর্ম্মে এত বড় প্রতিবাদ করার দুঃসাহস দেখিয়া তাঁহারা স্তম্ভিত হইলেন। আন্দোলন চলিল প্রচণ্ড প্রবাহে।• সারা বাংলায় আগুন জ্বলিল। সুরেন্দ্রনাথ বাঙ্গালী জাতিকে বয়কট-মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। বিলাতী বস্ত্রের বাজারে আগুন ধরিল। ইংরাজের পকেটে হাত পড়িল। তাঁহারা ম্যাঞ্চেষ্টার-ল্যাঙ্কেশায়ারের ব্যবসার দুয়ার বন্ধ হয় দেখিয়া আর্ত্ত-কণ্ঠ হইলেন। ভারতের ইংরাজ শাসকেরা বিলাতে সান্ত্বনা-বাণী পাঠাইলেন—আন্দোলনের কণ্ঠ তাঁহারা শীঘ্রই রোধ করিবেন। হাটে-বাজারে, সহর-পল্লীতে, নদীবক্ষে "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি উঠিল। সুরেন্দ্রনাথের সহিত বাগ্মী বিপিনচন্দ্র কণ্ঠ মিলাইলেন। ভূপেন্দ্রনাথ ঘরের বাহির হইলেন। পাঁচকড়ি, ব্রহ্মবান্ধব, শ্যামসুন্দর, কাব্যবিশারদ, কৃষ্ণকুমার লেখনীমুখে অগ্নিবর্ষণ করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ সেন বয়কট-মন্ত্রের সর্ব্বপ্রথম উদ্যোক্তা; তাঁহার ধ্বনিমন্ত্র বাঙ্গালী লুফিয়া লইল। বরিশালে অশ্বিনীকুমার মাথা তুলিলেন। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে হিন্দুনেতৃগণের সহিত ব্যবহারজীবী আবদুল রসিদ যোগ

দিলেন। মৌলভী আবু হোসেন "হিন্দু-মুসলমান দুই ভাই রাম-লক্ষ্মণের ন্যায়"—এই ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য-বন্ধনের চেষ্টা করিলেন। মৌলভী লিয়াকৎ হোসেন ছাত্রসঙ্ঘ গড়িয়া পথে-পথে স্বদেশী সঙ্গীত গাহিয়া বেড়াইলেন। এ আগুন নির্ব্বাপিত করার শক্তি ইংরাজের সাধ্যে কুলাইল না। ইংরাজেরা কূট-রাজনীতিক—হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করিয়া তাঁহারা এই মহাপ্লাবন রোধ করিতে চাহিলেন। তাঁহারা ঢাকার নবাব সলিমুল্লাকে আশ্রয় করিয়া বঙ্গভঙ্গ চিরস্থায়ী করার প্রচেষ্টা করিলেন। ঢাকার লাট স্যার ব্যাম্পফিল্ড ফুলার নবাব সলিমুল্লার সহায়তায় আন্দোলন-দমনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। জাতির কণ্ঠরোধ করার জন্য "বন্দেমাতরম্" মন্ত্র উচ্চারণ করাও নিষিদ্ধ হইল। হাটে-বাজারে বিলাতী-বস্ত্র-প্রচলনের জন্য পিকেটারদের ধরিয়া তাঁহারা জেলে পুরিলেন; কিন্তু বিধাতার অলক্ষ্য বিধানে ইহাতে ইংরাজ-সাম্রাজ্যের ভিত্তিক্ষয়ই অবশ্যম্ভাবী হইতে লাগিল। বরিশালের কঠোর রাজশাসন অগ্রাহ্য করিয়া বঙ্গ-নেতারা "বন্দেমাতরম্" শব্দে দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিলেন। প্রকারান্তরে ইংরাজই বাংলায় বিপ্লবের হোমানল পরিব্যাপ্ত করার সহায় হইলেন। তাঁহাদেরই ইন্ধনে বাংলার বিপ্লব উত্তরোত্তর প্রচণ্ডতর মূর্ত্তি ধারণ করিল।

বরিশালের প্রাদেশিক সম্মেলন রেগুলেশন লাঠীর আঘাতে বন্ধ হইল না। "বন্দেমাতরম্"-মন্ত্রধ্বনি গলা টিপিয়াও স্তব্ধ করা গেল না। চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতা পুলিসের লাঠী খাইয়া রক্তাক্ত কলেবরে পুষ্করিণীর মধ্যে নিপতিত হইয়াও মন্ত্র ত্যাগ করিলেন না। সহস্র-সহস্র কণ্ঠে তুমুল "বন্দেমাতরম্-ধ্বনি" উঠিল। ইমার্স ন সাহেবের গর্ব্বোন্নত শির নত হইয়া পড়িল। নেতারা ঘরে ফিরিয়া বরিশালে ইংরাজের অত্যাচার-কাহিনী রুদ্রকণ্ঠে প্রচার করিলেন। আইনের পর আইন প্রণয়ন করিয়াও বাংলার জাগরণ বন্ধ হইল না। বরিশালের অত্যাচার বাংলার

তরুণ নীরবে সহিল না। বারীন্দ্রকুমার এই সুযোগে "যুগান্তরে" রক্ত-পতাকা উড়াইলেন। বিপ্লবী অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত "যুগান্তর" বাহির করার সর্ব্বপ্রথম পুরোহিত হইলেন। অগ্নিমন্ত্রের প্রচারক "যুগান্তর" বাংলার প্রাণ উদ্বুদ্ধ করিল। এক বৎসরের মধ্যেই "যুগান্তর" সাত হাজার কপি করিয়া প্রকাশিত হইলে, উহা লক্ষ-লক্ষ তরুণের প্রাণে আগুন ধরাইয়া দিল। বারীন্দ্রকুমার দেড় বৎসর "যুগান্তর" পরিচালনা করিয়া মুরারিপুকুর বাগানে দুর্গ রচনা করিলেন। "যুগান্তরের" সূত্রেই উল্লাসকর, হেমচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ, হৃষীকেশ প্রভৃতি তাঁহার কর্ম্মে যোগদান করিলেন। উল্লাসের লেবরেটারীতে বোমানির্ম্মাণের আয়োজন হইল। হেম দাস পাশ্চাত্ত্য দেশ হইতে বোমানির্ম্মাণের কৌশল শিখিয়া আসিলেন। দলে-দলে তরুণেরা আসিয়া বারীন্দ্রকুমারের বিপ্লব-ব্রতে যোগদান করিলেন। সুরেন্দ্রনাথের স্বদেশী আন্দোলন এবং সর্ব্বজনের অগোচরে ইংরাজের শাসননীতি চূর্ণ করার প্রয়োজনে বোমা-নির্ম্মাণের আয়োজন নির্ব্বিবাদেই চলিল। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য সহজ ভাষায় "সন্ধ্যা" বাহির করিলেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি "সন্ধ্যার" ছত্রে-ছত্রে ইংরাজ-বিদ্বেষ প্রচার করিতে লাগিলেন। স্যার এণ্ড্রুজ ফ্রেজারের গাড়ী উল্‌টাইবার প্রয়াসের সংবাদে উপাধ্যায় "কালীমায়ীর বোমা" শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিলেন। তরুণমহলে সাড়া পড়িয়া গেল। "সন্ধ্যা" পড়ার ধূম পড়িল। অনুসন্ধান চলিল বিপ্লব-সংহতির। সুরেন্দ্রনাথের চমক হইল! তিনি বুঝিলেন—বাংলার তরুণের প্রাণে আগুন ধরিয়াছে। মুক্তকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করিলেন—বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধ ব্যবস্থা অসিদ্ধে পরিণত হইবে। অর্থাৎ রাষ্ট্রকর্ত্তৃপক্ষগণ যত বলেন যে, বঙ্গভঙ্গ 'Settled fact', তিনি জাতির পক্ষ হইতে তার প্রত্যুত্তরে ততই বলেন যে, ইহা 'unsettle' করিতে

বাঙ্গালীর দৃঢ় সঙ্কল্প। বাঙ্গালীর সেই সঙ্কল্প সিদ্ধ হইয়াছিল—তাহার জন্য সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ বাংলার জাতীয় নেতৃগণের আন্দোলনই শুধু দায়ী নহে, বাংলার বিপ্লবীরাও ইহার জন্য মৃত্যুপণ করিয়াছিল।

এই যুগেই কলিকাতায় সতীশচন্দ্র বসুর উদ্যোগে "অনুশীলন সমিতি"র প্রতিষ্ঠা হয়। এই "অনুশীলন সমিতি" নামেই ঢাকায় পুলিনবিহারী দাসও সমিতি স্থাপন করেন। সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গে ইহার প্রায় পাঁচশত শাখা সংস্থাপিত হয়। বাঙ্গালীজাতি সংহতিবদ্ধ হইয়া কেমন করিয়া বিদেশী রাষ্ট্রের মূলক্ষয় করিতে পারিয়াছিল, তাহা আজ সর্ব্বজন-বিদিত। এই সকল সংহতি আপামরসাধারণকে লইয়া বিপ্লবী নেতারা গড়িতে চাহেন নাই। সেইরূপ অবৈপ্লবিক কর্ম্মে তাঁহারা কালক্ষয় করেন নাই। বাংলার বিপ্লবীরা জানিতেন যে, অখণ্ড বাংলায় কয়েক সহস্র মানুষ প্রাণ বলি দেওয়ার ডাকে সাড়া দিতে শিখিলেই স্বাধীনতার পথ সুগম হইবে। এই হেতু বাংলায় বারীন্দ্রকুমারের দল মুরারিপুকুর বাগানে গঠিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই কলিকাতায় ও ঢাকায় "অনুশীলন সমিতি"র অভ্যুত্থান হয়। বারীন্দ্রকুমার রাষ্ট্রকর্ত্তৃপক্ষগণের মনে মরণভীতি উৎপাদন করিয়া রাষ্ট্রচক্র অচল করার পক্ষপাতী ছিলেন। অন্যপক্ষে "অনুশীলন সমিতি" বাংলার জেলায়-জেলায় যুব-সংহতি সংগঠন করিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে বিপ্লব-ঘোষণার আয়োজন করিতেছিলেন। এই সময়ে কাথিওয়াড়ের অধিবাসী শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মার উদ্যমও উল্লেখযোগ্য। তিনি ইংলণ্ডে অবস্থান করিয়া বৈপ্লবিক সংবাদপত্র ভারতে প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি ভারতীয় 'হোমরুল সোসাইটী' গঠন করেন। তাঁহার স্বাধীনতা-মূলক পুস্তিকা বাংলার বিপ্লবীদের সহায়তা করিত। এ দিকে বিনায়ক দামোদর সাভারকারও বার-বার নির্য্যাতিত হইয়া ভারতের বাহির হইতে বাংলার বিপ্লবীদের প্রাণে উৎসাহ সঞ্চার করিতেছিলেন। ১৯০৬

খৃষ্টাব্দে বরিশালে রাষ্ট্রসম্মেলন-ভঙ্গ করিয়া ইংরাজ তরুণ-বাংলার অন্তরে বিপ্লব-বীজ ছড়াইয়া দেওয়ার সহায়ক হন। বাংলার বিপ্লবীরা সর্ব্বপ্রথম বঙ্গ-ভঙ্গ রোধ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরাজ বাংলার সংহতিবদ্ধ বিপ্লবীদের সন্ধান পাইয়াই বাঙ্গালীজাতিকে অন্য দিক্ দিয়া দমন করার উদ্দেশ্যে বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত করেন। সুরেন্দ্রনাথের স্বদেশী-আন্দোলন ইহার পর শ্লথ হইয়া আসে। কিন্তু বাংলার বিপ্লবীরা বঙ্গ-ভঙ্গ রোধ করিয়াই নিরস্ত হইলেন না। তাঁহারা পররাষ্ট্রের বন্ধন হইতে মুক্তির আকাঙ্খায় অস্ত্রধারণ করিলেন। জনবল, অর্থবল ও অস্ত্রবল—এই ত্রিধারায় শক্তি-সঞ্চারের প্রবৃত্তি তাঁহাদের নবোৎসাহে মাতাইয়া তুলিল। "যুগান্তর" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত "ভবানীমন্দির", "বর্ত্তমান রণনীতি" ও "মুক্তি কোন্ পথে"—এই তিনখানি গ্রন্থ যেমন বৈপ্লবিক চিন্তা-গঠনে সহায়ক হইল, তেমনি অন্য দিকে "শ্রীশ্রীঠাকুরের কথামৃত", অশ্বিনী-কুমারের "ভক্তিযোগ" ও কুরুক্ষেত্রে প্রচারিত "গীতা" হইল সংস্কৃতি-রক্ষার আশ্রয়। ধর্ম্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্রগঠনের প্রেরণাই বাংলার মর্ম্মে ফুটিয়াছিল। বিধাতার বিধানে চন্দননগরই ক্রমে তাহার পীঠস্থানে পরিণত হইযাছিল। সেই নিগূঢ় চিন্তা ও কর্ম্মের ইতিহাসই জানিবার ও শুনিবার দিন আসিয়াছে। ইহা অবজ্ঞাত রাখিয়া আজিকার রাষ্ট্র-সংগঠনের সন্ধি-মুহূর্ত্তে আমাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টা যে সফল হইতে পারে না, তাহা বুঝিয়া আমরা ধীরে-ধীরে জাতিকে স্বাধীনতা-রক্ষার উপযোগী করিয়া যাহাতে গড়িতে পারি, সেই দিকেই আজ আমাদের লক্ষ্য রাখিতে আহ্বান জানাইব।

চন্দননগরে বারীন্দ্রকুমার

ভারতের স্বাধীনতার্জ্জনের জন্য যে জল্পনা-কল্পনা চলিয়াছিল, তাহার সর্ব্বপ্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ব্যারিষ্টার পি-মিত্র। তাঁহার উৎসাহে ও উদ্যোগে "অনুশীলন সমিতি"র প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় কলিকাতা মহানগরীতে সতীশচন্দ্র বসুকে কেন্দ্র করিয়া। এই প্রতিষ্ঠানে বাংলার তরুণদের মধ্যে বিপ্লবের বীজ-বপন চলিতে থাকে। সতীশবাবুর অনুশীলন সমিতির লক্ষ্য ও আদর্শ পূর্ণ স্বাধীনতা হইলেও, কার্য্যতঃ তিনি ইহা তরুণদের বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয় করিয়াই রাখিতে চাহিয়াছিলেন। বৈপ্লবিক কর্ম্মপ্রচেষ্টার পরিপন্থী মনোভাব লইয়া তিনি অনুশীলনের কার্য্য পরিচালনা করেন। অন্যদিকে দীর্ঘ দিন ধরিয়া সরলা দেবী ভারতের মুক্তির জন্য কয়েক জন ব্রহ্মচারীর চরিত্রগঠনের প্রয়াস করিতেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের "দেবী চৌধুরাণী" গ্রন্থোক্ত ভবানী পাঠকের চরিত্রগঠনের নীতি সম্ভবতঃ কার্য্যে পরিণত করিতে তিনি উদ্যতা হইয়াছিলেন। কিন্তু বারীন্দ্রকুমার ইংরাজকে দেশ হইতে দূর করার জন্য সর্ব্বাগ্রে সন্ত্রাসবাদ প্রচার করার কাজে নিবিষ্টচিত্ত হইলেন। হেমচন্দ্র দাস বোমা-প্রস্তুতিতে মন দিলেন। তাঁহার সহকারী বিপ্লবী বন্ধুগণ অস্ত্রসস্ত্র-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। "যুগান্তর"-পত্রের মুদ্রাকরদের প্রতি দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন লালবাজারের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ড সাহেব। কলিকাতায় বিপ্লববাদের দমন-কার্য্যে কিংসফোর্ডের নাম তরুণদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আর বঙ্গ-ভঙ্গের অন্যতম প্রধান পুরোহিতরূপে পশ্চিম বঙ্গের ছোটলাট এণ্ড্রুজ ফ্রেজারও বাঙ্গালীর ঘোর বিদ্বেষভাজন হইয়াছিলেন। এই দুই ব্যক্তিকে অপসারিত করার উদ্দেশ্য লইয়া বারীন্দ্রকুমারের বৈপ্লবিক অভিযান শনৈঃ-শনৈঃ অগ্রসর হইতেছিল। অন্যদিকে বিপিনচন্দ্র পাল ও পি-মিত্র ঢাকায় গিয়া পুলিনচন্দ্র দাসের সহযোগিতায়

বৈপ্লবিক কেন্দ্র স্থাপন করিলেন। কলিকাতার "অনুশীলন সমিতি"র নেতৃত্বাধীনে ভারতের বিপ্লব-চিন্তা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনসাপেক্ষ হইয়াই রহিল। ঢাকায় পুলিনবাবু বিপিনচন্দ্র ও পি-মিত্রের নিকট হইতে দেশব্রতের দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ব-বঙ্গে বিপ্লবের প্রসিদ্ধ নেতৃরূপে সর্ব্বজনপরিচিত হইলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বিপ্লবের কর্ম্ম লইয়া অর্থসঞ্চয়ের দিকেই দৃষ্টি দিলেন। "অনুশীলনসমিতি"র বোধ হয় লক্ষ্য ছিল—দেশব্যাপী সংহতি সৃজন করিয়া তাঁহারা অর্থসংগ্রহের দ্বারা বিদেশ হইতে অস্ত্রের আমদানী করিবেন। তারপর বিরাট্ বিপ্লব সৃষ্টি করিয়া তাঁহারা ইংরাজের হস্ত হইতে শাসনভার কাড়িয়া লইবেন। পুলিনবাবু সংহতি গড়ার সুযোগ পাইলেন। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ-দমনোপলক্ষে হিন্দুর ধনপ্রাণ যাহাতে রক্ষা পায়, তিনি সেই দিকে স্বভাবতঃই হিন্দু তরুণদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। পূর্ব্ব-বঙ্গে ঢাকার নবাব সলিমুল্লার প্ররোচনায় যে সকল মুসলমান হিন্দু-বিদ্বেষী হইয়াছিল, "অনুশীলনসমিতি"র আবির্ভাবে তাঁহাদের উন্নতশির অবনত হইল। পূর্ব্ব-বঙ্গের প্রতি জেলায়, প্রতি নগরে "অনুশীলন-সমিতি"র শাখা গড়িয়া উঠিল। এই বিপুল কর্ম্মে পি-মিত্র প্রমুখ যে কয় জন ভদ্রলোক অগ্রণী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রদত্ত অর্থ সমিতি-রক্ষার পক্ষে অপ্রচুর মনে হওয়ায়, দেশের অর্থশালী লোকের গৃহলুণ্ঠন করাই এই সঙ্কট-পরিহারের একমাত্র উপায় বলিয়া স্থির হইল। পুলিনবাবু "অনুশীলনসমিতি"র তরুণদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য নানাবিধ ব্যায়াম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। লাঠী-খেলায় ও ছোরা-খেলায় তাহারা দক্ষ হইয়াছিল; কিন্তু ভদ্রসন্তানেরা দস্যুবৃত্তি কর্ম্মে অগ্রসর হইয়া প্রথম ব্যর্থ হইয়াই ফিরিয়াছে।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এক বিধবার গৃহলুণ্ঠনের আয়োজন সর্ব্বতোভাবে ব্যর্থ হয়; তাহার কারণ সমিতির সভ্যগণ সেদিনও ততখানি সাহস ও

দক্ষতা আয়ত্ত করিতে পারে নাই। ঐ বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসেও দস্যুবৃত্তি করিতে গিয়া বিপ্লবিগণের যে ব্যর্থতা তার ইতিহাস রাউলাট সাহেবের গ্রন্থে লিখিত আছে। একটী লোহার সিন্দুক ভগ্ন করিতে না পারিয়া অর্থলুণ্ঠনের কাজে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। এইরূপ বহু অভিজ্ঞতার পর •"অনুশীল নসমিতি" অর্থসঞ্চয়ের জন্য যেরূপ অধিকতর প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার ইতিহাসও পরে আমরা ব্যক্ত করিব।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সমগ্র বাংলায় যখন স্বদেশ-প্রেমের ঢেউ বহিয়াছে, এই সময়ে উন্নতচরিত্রের তরুণেরা যেমন নগরে-নগরে আত্ম-রক্ষার জন্য লাঠী-খেলা ও ছোরা-খেলার দল গড়িয়া তুলিয়াছিল, তার সঙ্গে-সঙ্গে জাতীয়তামুলক সাহিত্য এবং ইতিহাসের পঠন-পাঠনেরও ব্যবস্থা করিযাছিল। দেশের চরিত্রহীন তরুণেরাও স্বদেশ-প্রেমের নজির বুকে ধরিয়া দেশপ্রীতির পরিচয় দিতে অগ্রসর হইত। স্বদেশীর বান ডাকিয়াছিল। বিচারের অবকাশ ছিল না। এরূপ কোন-কোন চরিত্রহীন যুবক স্বদেশ-ব্রতী হইয়া দেশের ক্ষতিসাধনও করিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে মন্ত্রগুপ্তি-রক্ষা সম্ভবপর না হওয়ায়, প্রতিপক্ষের কাণে অর্থের দায়ে ইহারা অনেক সমিতির গোপন কথা ফাঁস করিয়া বহু প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই নষ্ট করিয়া দিযাছে।

অর্দ্ধোদয়-যোগে শত-শত বিপ্লবী স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে কিছু চরিত্রহীন যুবক সমবেত হইয়া দেশসেবকদের কর্ম্ম কোন-কোন ক্ষেত্রে পণ্ড করিয়াছে। সেদিন মহান্দোলনের যুগ, ভাল-মন্দের বিচার করার অবকাশ ছিল না। আঘাতে-আঘাতে বিপ্লবের সমিতিগুলি খাঁটি মানুষ বাছিয়া লইযাছে। কিন্তু তাহার পুর্ব্বে অনেক মূল্যই দিতে হইয়াছে।

বারীন্দ্রকুমার অর্থসঞ্চয়ের জন্য দেশের লোকের গৃহ-লুণ্ঠনের কাজে প্রমত্ত হন নাই। তিনি ধনবান্‌দের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতেন। এই নীতিই পশ্চিম বঙ্গের বিপ্লবসমিতিদের একমাত্র আশ্রয়

হইয়াছিল। অর্থ দান করিতে বাঙ্গালী জাতি কৃপণতা করে নাই। এণ্ড্রুজ ফ্রেজার ও কিংসফোর্ডকে হত্যা করার কথা শুনাইয়া প্রচুর অর্থ-সঞ্চয় হইত। বারীন্দ্রকুমার মুরারিপুকুর বাগানে বিপ্লবের যে দুর্গ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা "যুগান্তরের দল" বলিয়া তিনি কোন দিনই ঘোষণা করেন নাই। "যুগান্তর" ছিল বিপ্লবের পথে জাতিকে উৎসাহ দিবার মুখপত্র। এই পত্রিকার নামে দল-গঠনের সংবাদ আমরা আজ শুনিতেছি। ইহার পূর্ব্বে "যুগান্তর দল" বলিয়া কোন কথাই আমাদের জানা ছিল না। বঙ্গভঙ্গ হওয়ার পর হইতেই বিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, তালুকদার, জমিদার, ব্যবসাজীবী প্রত্যেকেই ইংরাজ-বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিল। মুরারিপুকুরের লহিত চন্দননগরের সংযোগ-সৃষ্টির কথা অবগত হইলেই বারীন্দ্রকুমারের লোক-সংগ্রহের ধরণ কিরূপ ছিল, তাহা বুঝা যাইবে।

স্বদেশীযুগ সুরু হওয়ার পূর্ব্ব হইতেই চন্দননগরে একটি শক্তিশালী সংহতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দের বীরবাণী আশ্রয় করিয়া একদল তরুণ দরিদ্রনারায়ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া "সৎপথাবলম্বী সম্প্রদায়" সংগঠন করিয়াছিল। চন্দননগরের উক্ত সমিতিতে তাৎকালীন অনেক তরুণই সেবকশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল। প্রবীণ শিক্ষিত শ্রেণীর সমর্থনও মিলিয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতৃ-রূপে ঈশ্বর আমাকেই সেই অধিকার দিয়াছিলেন। এই সমিতির সহকর্ম্মী তিন জনের নাম আমি উল্লেখযোগ্য মনে করি। কেন-না পরবর্ত্তী বিপ্লব-যুগে তাঁহাদের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হই নাই। ইঁহাদের নাম সাগরকালী ঘোষ, ননীলাল দে ও সত্যচরণ কর্ম্মকার।

বারীন্দ্রকুমার ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের বিজয়াদশমীর দিন সন্ন্যাসীর বেশে চন্দননগরে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মুখে হুগ্লে কলেজের অধ্যক্ষ চারুচন্দ্র রায়ের পরিচয় পাইয়াছিলেন। চারুচন্দ্র চন্দননগরের তরুণদের মনের উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। স্বদেশীযুগের আরম্ভকালে তিনি এক বিরাট্ শোভা-যাত্রার আয়োজন করিয়া সুরেন্দ্রনাথকে আনিয়াছিলেন। রথের সড়কে গোপালবাবুর বাগানে যে বিপুল স্বদেশী সভা হয়, তাহার স্মৃতি আমাদের কোনও দিনই মুছিবে না। তরুণেরা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক, জগৎ-জনের শ্রবণ জুড়াক" গান গাহিলে, সুরেন্দ্রনাথ অগ্নিময়ী ভাষায় বক্তৃতা করেন। ইহার পর হইতেই চারু বাবুর বহির্ব্বাটীর একটি ক্ষুদ্র কক্ষে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁহার নিজের জ্বালাময়ী বক্তৃতাও শ্রবণ করিতাম। বারীন্দ্রকুমার দশমীর প্রভাতে চন্দননগরের এই অদ্বিতীয় নেতার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নানা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। পরিশেষে নিজের পরিচয় দিয়া তিনি বলিলেন যে, বাংলায় যে ব্যাপক বিপ্লব-যজ্ঞের আরম্ভ হইয়াছে, তাহারই একজন হোতার আসন চারুবাবুকে গ্রহণ করিতে হইবে। চারুচন্দ্র স্বীকৃত হইলেন। চন্দননগরে বিপ্লব-সংহতির সূত্রপাত এই সহযোগের ফলেই ঘটিয়াছিল।

বিপ্লব-নায়ক চারুচন্দ্র

চারুচন্দ্র সর্ব্বপ্রথমেই চন্দননগরের ধনকুবের ৺ভুঙ্গেশ্বর শ্রীমাণীকে দলভুক্ত করার প্রয়াস করেন। শ্রীমাণী নিজেকে ধরা না দিয়া, এই ক্ষেত্র হইতে মুখ ফিরাইলেন। পরে চারুবাবু অবশ্য তাৎকালীন উকিল বনমালী পালকে বিপ্লবের কর্ম্মে সহযোগি-রূপে পাইলেন। তারপর তদানীন্তন পুলিস-কোতোয়াল ধ্রুবদাস কোলেকেও তিনি স্বমতে আনিলেন। কিন্তু এইরূপ সংহতি খুব বেশী কার্য্যকরী হইবে না বুঝিয়া, তিনি তরুণদেরও দলভুক্ত করিলেন। তিনি শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, কানাইলাল

দত্ত ও নগেন্দ্রনাথ ঘোষকে অন্তরঙ্গ সভ্যরূপে মনোনীত করিলেন। তাঁর এই উদ্যমের উপর ভিত্তি করিয়াই চন্দননগরে প্রথম বিপ্লব-সংহতি গড়িয়া উঠিল।

বারীন্দ্রকুমারের কর্ম্ম পূর্ব্বেই সুরু হইয়া গিয়াছিল, তৎপরে সে কর্ম্ম-তৎপরতা বৃদ্ধি পাইল। চারুচন্দ্র রায়কে তিনি যে নীতির আশ্রয়ে বিপ্লবসমিতিতে টানিয়া আনিয়াছিলেন, তদনুরূপ নানাভাবে তিনি ও মুরারিপুকুরের প্রবীণ বিপ্লবীরা শ্রীরামপুরের গোঁসাই-গোষ্ঠীর নরেন্দ্র নাথ গোস্বামীকে, উত্তরপাড়ার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে ও নাড়াজোলের রাজা প্রভৃতি নানা অভিজাত-শ্রেণীর মানুষদের বিপ্লবি-শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্টে কলিকাতায় শোভাযাত্রা দেখিয়া, "সৎ-পথাবলম্বী সম্প্রদায়ে"কে লইয়া সেইদিন রাত্রেই চন্দননগরের পথে-পথে "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে-রে ভাই" গাহিয়া আমি ভ্রমণ করি। ৩০শে অক্টোবর ১৯০৫ বঙ্গভঙ্গের ব্যবস্থা কায়েমী হয়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের রাখীবন্ধনোৎসবে চন্দননগরের তরুণেরা মাতিয়া উঠে। আমরা নগরকীর্ত্তন করিয়া যখন চারুচন্দ্র রায়ের পল্লীপথে চলিয়াছি, তখন একজন ঘোর কৃষ্ণকান্তি লোক গলা ধরিয়া, আমায় জানাইল যে, আমার সহিত পরিচয় করার তাহার বড় ইচ্ছা, আজ এই সুযোগ-লাভে সে ধন্য হইয়াছে। তারপর এই যুবক কীর্ত্তনের সঙ্গে আমার বাড়ীতে উপস্থিত হয়। রাখীবন্ধনের দিন নেতৃগণের নির্দ্দেশে আমরা শতাধিক তরুণ একত্র ফলাহার করি; এই যুবকও তাহাতে যোগদান করে। পরে জানিলাম যে, তাহার নাম শ্রীশচন্দ্র ঘোষ। তাহারই আহ্বানে আমি নিয়মিত ভাবে চারুবাবুর বাড়ী যাতায়াত করিতে থাকি। চারুবাবু "সৎপথাবলম্বী সম্প্রদায়কে" বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য আমায় উৎসাহ প্রদান করেন এবং ইহার জন্য তিনি সাহায্য করিতেও কাতর হন

নাই। শ্রীশচন্দ্রের অনুরোধে আমি প্রতি রবিবার চারুবাবুর ক্ষুদ্র গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিতাম—কানাইলাল, শ্রীশচন্দ্র, বিশ্বনাথ সরকার, বিশ্বনাথ সিংহ ও নগেন্দ্রনাথ ঘোষ চা পান করিতে-করিতে স্বদেশী আন্দোলনের সম্বন্ধে উৎসাহপূর্ণ আলোচনা করিতেছেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে ছোটলাট বাহাদুরের গাড়ী উল্টাইবার প্রচেষ্টা মানকুণ্ডু ষ্টেশনের নিকটেই হওয়ার সংবাদ আগুনের মত সহরে ছড়াইয়া পড়ে। চারুচন্দ্র উৎসাহের সহিত আমাদের বলেন যে, ট্রেণ-ধ্বংসের চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু বোমাটী কার্য্যকরী হয় নাই—ভবিষ্যতে এইরূপ হইবে না। এইরূপ সিদ্ধান্তপূর্ণ বাক্য তিনি বলিতে লাগিলেন। আমি সেদিন বিস্মিত হইয়া ভাবিলাম—চারুবাবু কি এই বিপ্লব-সংস্রবে বিজড়িত আছেন! তাঁহার দরদপূর্ণ কথা শুনিয়া সেইদিন এইটুকু মাত্রই মনে হইয়াছিল।

তারপর, আবার ৬ই ডিসেম্বর মেদিনীপুরে ছোটলাট বাহাদুরের গাড়ী উড়াইয়া দিবার প্রচেষ্টার সংবাদ পড়িয়া তিনি আপশোষ করিয়া বলিলেন "আঃ, এবারও বেটা বাঁচিয়া গেল।" তাঁহার কথা শুনিয়া আমার ধারণা দৃঢ় হইল—তিনি নিশ্চয়ই বিপ্লব-দলভুক্ত আছেন। তিনি ইংরাজের হস্ত হইতে শাসনভার কাড়িয়া লওয়ার যুক্তিপূর্ণ উপদেশ আমাদের দিতেন; কিন্তু কোন দিন আমায় বিপ্লবীদের দলভুক্ত করার কথা উথাপন করিতেন না। ধীরে-ধীরে শ্রীশচন্দ্র ও কানাইলালের সহিত আমার প্রণয় দৃঢ় হইল। উভয়েই প্রতি সন্ধ্যায় আমার বাড়ী আসিয়া দেশের মুক্তি আনিবার জল্পনা-কল্পনা করিত। আমি এই সকল প্রসঙ্গে অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করিতাম।

কানাইলাল মাতুলালয়ে বাস করিত। মাতুলের নাম নন্দলাল দত্ত। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর তাঁহার বসতবাটীর সংলগ্ন একখণ্ড বাগান; এই বাগানে কানাইলাল এক ব্যায়াম-সমিতি গড়িয়া

তুলিল। প্রতিদিন অপরাহ্নে শত-শত তরুণ ব্যায়ামে যোগদান করিত। আমি এই সময়ে চাকুরী করিতাম। প্রতি শনিবার ও রবিবার এই সমিতিতে যোগদান করিতাম। কানাইলালের সহিত পরামর্শান্তে ব্যায়াম-সমিতির সমস্ত সভ্যগণকে লইয়া রবিবাসরীয় একটি পাঠচক্রের প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল। এই পাঠচক্রের সভাপতি হইলাম আমি ; তরুণদের মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত করার জন্য গীতা, উপনিষৎ, রামায়ণ, মহাভারতের আলোচনার সঙ্গে স্বদেশপ্রাণতামূলক নানা প্রবন্ধও লেখা হইত এবং পাঠচক্রে ঐগুলি পঠিত হইত। আমার ভাবপ্রবণতা ছিল অধিক। বিচিত্র প্রবন্ধ লিখিয়া, সমিতির সভ্যগণকে আনন্দ ও উৎসাহ দিতাম। সেদিনও কানাইলাল যে চারুচন্দ্রের বিপ্লবসমিতির চিহ্নিত কর্ম্মী, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। একদিন প্রাতঃকালে চারুবাবুর বীর্য্যময়ী বাণী কাণ পাতিয়া শুনিতেছি—সংবাদপত্র আসিল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর। কাগজে দেখিলাম—ঢাকা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট গোয়ালন্দ ষ্টেশনে গুলীতে আহত হইয়াছেন। চারুবাবু লম্ফ দিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন—"এ কাজ কাহাদের দ্বারা হইল। নিশ্চয় 'অনুশীলন সমিতি' ডাকাতি ছাড়িয়া সন্ত্রাসবাদে মন দিয়াছে!" তাঁহার এই কথায় দৃঢ় প্রত্যয় হইল—চারুবাবু বিপ্লবপন্থীদের দলভুক্ত।

স্বদেশীর মন্ত্রে হৃদয় সেদিন উদ্বুদ্ধ। "সৎপথাবলম্বী সম্প্রদায়ে"র মধ্যে রাষ্ট্রনীতিক কার্যকলাপ প্রবেশ করিতে দেখিয়া প্রবীণ সভ্যেরা সম্প্রদায়ের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে "সৎপথাবলম্বী সম্প্রদায়ে"র বাৎসরিক সভা স্বামী অভেদানন্দজীকে সভাপতি-পদে বরণ করিয়া মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি করিয়া যে বাৎসরিক অধিবেশন আহ্বান করি, স্বদেশী খাতায় আমার নাম উঠায়, ফরাসী পুলিস সেই সভাক্ষেত্র ঘিরিয়া

রহিল। আমরা সভার কর্ম্ম স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইলাম। তারপর হাটখোলায় এক স্বদেশী সভায় শ্যামসুন্দরকে আহ্বান করিয়া আনা হইয়াছিল। ফরাসী পুলিস এই সভাক্ষেত্রটীকেও বেষ্টন করিয়া জনসভার আয়োজন বন্ধ করিয়া দিল। এই সময়ে একজন ফরাসী মঁসিয়ে তার্দিভেল চন্দননগরের মেয়র ছিলেন ; তিনি স্থানীয় এড্‌মিনিষ্ট্রেটরকে অপসারিত করিয়া চন্দননগর হইতে স্বদেশী প্রচার বন্ধ করিতে মনঃস্থ করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় স্থানীয় তরুণদের মন তিক্ত হইয়াছিল। শ্রীশচন্দ্র ঘোষ এই সকল অসন্তুষ্ট তরুণদের উস্কানি দিয়া গভর্ণমেণ্টের বাড়ীঘর লুট করার আলোচনা সুরু করিল। অনেকের সহিত আমিও এই কর্ম্মে অগ্রণী হইলাম। তখন বুঝি নাই—চারুবাবুর নির্দ্দেশে তরুণদের চরিত্রের পরিচয় লওয়াই শ্রীশচন্দ্রের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কাহার-কাহার প্রাণে আগুন ধরিয়াছে—ইহা বুঝিয়া লইয়া এই লুটের কাজ হইতে পরে সে আমাদের প্রতিনিবৃত্ত করিল।

আমার হৃদয় সান্ত্বনা পাইল না। সুপ্ত রাজসিকতা এই ঘটনায় জাগ্রৎ হইল। আমি অদম্য উত্তেজনায় অস্থির হইয়া আমার সহকারী বন্ধু ননীলাল দে-কে বলিলাম—"অত্যাচারী মঁসিয়ে তার্দিভেলকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে অপসারিত করিতে হইবে, তুমি ইহাতে রাজী আছ কি-না ?"

ননীলাল, সাগরকালী ঘোষ ও আমি—এই তিনজনে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছিলাম যে, যে কোনও কারণ ঘটুক, আমরা কিছুতেই ঐক্যভঙ্গ করিব না। এই শপথ-মন্ত্রই ভবিষ্যতে অভিনব সৃষ্টির হেতু হইয়াছিল।

ননীলাল আমায় বলিল 'আমাদের রিভলভার নাই, কোনরূপ অস্ত্র নাই, অতএব ইহা কেমন করিয়া সম্ভবপর হইবে ?"

চারুবাবুকে বিপ্লবপন্থী বলিয়া আমার ধারণা দৃঢ় হইয়াছিল। কানাইলালের সহিত তাঁহার গভীর পরিচয়ের কথাও বুঝিয়াছিলাম। কানাইলাল নিশ্চয় একটি রিভলভার দিতে পারে, এই আশায় তাহাকে

পত্র লিখিলাম—"তুমি যদি নির্ভীক হও, আমার সহিত বোড়াই-চণ্ডীতলার শ্মশানঘাটে দ্বিপ্রহর রাত্রে সাক্ষাৎকার করিও ; দেশ ও জাতির প্রয়োজনে আহ্বান।"

পত্রে নাম দিলাম না। কানাইলাল পত্র পাইয়া যথাসময়ে শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমায় দেখিয়া হাসিয়া বলিল "আমার অনুমান মিথ্যা হয় নাই। এরূপ পত্র তুমি ভিন্ন অন্যে লিখিবে না—এ কথা ভাল করিয়াই জানি !"

কানাইলালকে সকল কথা বলিলাম। কানাইলাল আমায় আশ্বাস দিয়া বলিল "তোমার ইচ্ছা ভালভাবেই চরিতার্থ হইবে, সে ব্যবস্থা আমি করিতেছি।"

এই দিন হইতে কানাইলালের সহিত আমার পরিচয় নিবিড় হইল। এই দিন হইতে আমরা ঘনিষ্ঠভাবে বিপ্লবের কাজে আত্মনিয়োগ করিলাম। তারপর ১১ই এপ্রিল ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে মঃ তার্দ্দিভেল স্বগৃহে যখন নৈশভোজে ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁহার গৃহে বোমা নিক্ষিপ্ত হইল। কিন্তু সে বোমাও বিদীর্ণ হইল না। মঁসিয়ে তার্দ্দিভেল প্রাণে বাঁচিলেন। সারা সহরে হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। কানাইলাল পরদিন প্রাতঃকালে আসিয়া বলিল "চেষ্টা সফল হয় নাই বলিয়া আমাদের দুঃখ নাই, ক্রমে দেখিও—বিপ্লবীর সকল কর্ম্মই কার্য্যকর হইতেছে।"

ইহার পর হইতে বিপ্লব-দলের সহিত আমার অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটিল। চারুচন্দ্র রায়ের অন্তরঙ্গ কর্ম্মী বলিয়া পরিচয় গাঢ় হইল। বিপ্লব-কর্ম্মও ক্রমে-ক্রমে বাড়িয়াই চলিল।

চন্দননগরের মেয়র মঃ তার্দ্দিভেলের উপর বোমা-নিক্ষেপে তাঁহার প্রাণনাশ হইল না বটে, কিন্তু তিনি হাড়ে-হাড়ে বুঝিলেন—বাংলার বিপ্লবীকে চক্ষুঃ রাঙ্গাইয়া দমনে রাখা আর সম্ভবপর নহে। তিনি তল্পি-তল্পা বাঁধিয়া ফ্রান্সে প্রস্থান করিলেন। দেশের লোক গর্ব্ববোধ করিল

তাহাদের প্রভাবের মাত্রা দেখিয়া! কিন্তু যাহারা অত্যাচারীর দণ্ড-বিধানে প্রাণ দিতে আগাইয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা অঙ্গুলীগণনায় শেষ হইয়া যায়। বাংলার মুষ্টিমেয় বিপ্লবিগণই 'ভেতো বাঙ্গালীর' সুনাম রক্ষা করিয়াছিল।

পশ্চিম বঙ্গের বিপ্লবীদের লক্ষ্য হইল—ছোটলাট এণ্ড্রুজ ফ্রেজারের প্রাণনাশ এবং কিংসফোর্ড সাহেবকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে সরাইয়া দেওয়া। এই সময়ের বিপ্লবীরা মনে করিতেন যে, প্রত্যেক অত্যাচারীর প্রাণসংহার করিতে পারিলে, স্বভাবতঃই ইংরাজের রাষ্ট্রশক্তি শিথিল হইয়া পড়িবে; ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়া ভারতবাসীকে স্বাধীনতা দিবে। এই হেতু বারীন্দ্রকুমার সন্ত্রাসবাদীর দল গড়িয়াছিলেন। অস্ত্রসংগ্রহ করার দিকে বাংলার বিপ্লবীরা সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন। হেমচন্দ্র নির্ম্মাণ করিতেন প্রাণঘাতী বোমা; উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ইহার নাম দিয়াছিলেন "কালীমায়ীর বোমা"। কিংসফোর্ড সাহেব যখন খিদিরপুরে বাস করিতেন, সেই সময়ে তাঁহাকে একটি পুস্তকের পার্সেল প্রেরণ করা হয়। তাঁহাকে হত্যা করার প্রচেষ্টা চলিতেছে—গোয়েন্দা পুলিসের মুখে একথা তিনি বিদিত ছিলেন। এই পার্সেলটী তিনি নিজে না খুলিয়া বিস্ফোরক-পদার্থবিদ্‌দের নিকট দেন। তাঁহারা সতর্ক হইয়া পার্সেল খুলিয়া দেখেন যে, উহা বোমা। একখানি বৃহৎ পুস্তকের মধ্যভাগে গর্ত্ত করিয়া সাংঘাতিক বিস্ফোরক দ্রব্য স্থাপন করা হইয়াছে। পার্সেলটী খুলিয়া পুস্তকের পাতা উল্টাইলেই পুস্তকমধ্যস্থিত বিস্ফোরক দ্রব্য বিদীর্ণ হইয়া পাঠকের প্রাণনাশের কারণ হইবে। কর্ত্তৃপক্ষগণ কিংসফোর্ড সাহেবের প্রাণরক্ষার জন্য পুলিস আদালত হইতে সরাইয়া তাঁহাকে মোজাফঃরপুরে দায়রা জজ করিয়া দিলেন।

চৈত্রমাস শেষ হইল। বৈশাখের প্রখর রৌদ্রে বাংলা ঝলসিয়া উঠিল। অশ্বত্থ বৃক্ষে কাঁচা পত্র উদ্গত হইল। এক নিদাঘের অপরাহ্নে

গঙ্গাতীরে পদচারণা করিতে-করিতে কানাইলাল আমায় জানাইল—তাহার ডাক আসিয়াছে, তাহাকে বাড়ী ছাড়িতে হইবে।

আমি সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। দীর্ঘ নাসিকা। দুটি ওষ্ঠপুটের ফাঁকে হাসির জ্যোৎস্না ঠিকরাইয়া বাহির হইতেছে। কানাইলাল স্মিতমুখে বলিল "উপস্থিত কলিকাতায় যাইব। পি-এম্ করার খাঁটী লোকের অভাব হইয়াছে। দেখিতেছ না, এলেন সাহেবের হত্যা হইতে, এণ্ড্রুজ ফ্রেজার, তার্দ্দিভেল—কোন ক্ষেত্রেই সাফল্য নাই। তাহার কারণ কি জান? পলাইবার প্রচেষ্টাই বড়—কার্য্যসিদ্ধির অপেক্ষা। এই ত্রুটি যাহাতে না ঘটে—তাহার জন্যই আমাদের আগাইতে হইবে।"

আমি দৃঢ়চিত্ত কানাইলালের কঠিন প্রস্তরসদৃশ ললাটের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলিলাম 'তুমি কি করিবে?"

সে দৃঢ়তাব্যঞ্জক স্বরে বলিল "আমি প্রাণের চেয়ে পি-এম্ যাহাতে কার্য্যকর হয়, সেই দিকেই বিপ্লবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব।"

'পি-এম্' সাঙ্কেতিক ভাষা—অর্থ 'political murder.'

কানাইলাল বলিল "সম্ভবতঃ আমি মোজাফঃরপুরে যাইব। কিংসফোর্ডকে চিরবিদায় দিতে হইবে। সে কোথাও নিষ্কৃতি পাইবে না—বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষদের একথা বুঝাইতে হইবে।"

আমি সব শুনিলাম। তার পরদিন সন্ধ্যায় সে আমার বাড়ী আসিল—হাসিতে-হাসিতেই বলিল "তোমার নিকট হইতে বিদায় লইতে আসিয়াছি। দাদাকে কিছু বলি নাই; মাকে বলিয়াছি যে, আমি চাকুরীর চেষ্টায় যাইতেছি, চাকুরী পাইলেই ফিরিব।"

কানাইলালের বিধবা মাতা, কয়েকটী অনূঢ়া ভগ্নী এবং একজন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—নাম তাঁর ডাঃ আশুতোষ দত্ত। কানাইলাল সে-বার বি-এ পরীক্ষা দিয়াছে; তখনও ফল বাহির হয় নাই। সে চলিয়াছে

বিপ্লবযজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "এই কার্য্যের জন্য অন্য লোক কি পাওয়া যায় না ?"

কানাইলাল হাসিয়া উত্তর দিল "বিপ্লবীর খাতায় যাহারা নাম লিখাইয়াছে, নেতার ডাকে তাহাদের সাড়া দিতে হইবে। একদিন তোমারও ডাক আসিতে পারে। তোমাকেও আমরা বিপ্লবিশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইয়াছি।"

সে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমার চিত্ত নির্ভয় ছিল। চাঁদের জ্যোৎস্না আড়াল করিয়া দালানের থাম ছায়া সৃষ্টি করিত মেঝের উপর। মরণের ভয় ছিল না। কিন্তু বন্দীদশায় এই ক্ষুদ্র ভবনটীর পবিত্র স্মৃতি মন হইতে মুছিতে পারিব কি-না—সংশয় হইত। আমি সব কথাই তাহার মুখে শুনিয়া, বাড়ী হইতে দুইখানি পরোটা ভাজাইয়া তাহার সম্মুখে ধরিলাম। কানাইলাল পরিতৃপ্তির সহিত তাহা ভোজন করিল। তারপর আলিঙ্গন দিয়া বিদায় লইল হাসিমুখে। বুকে সে রেখা চিরাঙ্কিত আছে, মুছিবে না কোনদিন—কানাইলালের এই শেষ বিদায়-দৃশ্য !

কানাইলাল ১৬ই কি ১৭ই এপ্রিল চন্দননগর ত্যাগ করিল। কিছুদিন পরে শ্রীশচন্দ্র আসিযা সংবাদ দিল "কানাইলাল উপস্থিত হেমচন্দ্রের নিকট বোমা-প্রস্তুতির শিক্ষালাভ করিবে। বারীন্দ্রকুমার তাহাকে মাণিকতলার বাগানে থাকিতে না দিয়া, কলিকাতার এক বাসাবাটীতে থাকিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন।" শ্রীশচন্দ্র বিপ্লবীদের সংবাদ দিয়া যায় ঃ আমি শুনি। কানাইলালের কথা ভাবি। সমিতিতে গিয়া লাঠিখেলায় যোগ দিই। কানাইলালের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত আলাপ করি। অনূঢ়া ভগ্নীগুলির প্রতি স্নেহ দেখাই। বিধবা জননীর সংবাদ রাখি। কানাইলাল আমাদের বিপ্লবী সমিতি হইতে অগ্র-পুরোহিতরূপে মাণিকতলার কাজে যোগ দিয়াছে—গর্ব্বে হৃদয় ফুলিয়া

উঠে। যে কোন মুহূর্ত্তে বিপদের আশঙ্কায় হৃদয় দুরু-দুরু করিয়া নাচে। প্রতি রাত্রে শ্রীশচন্দ্র আসিয়া নানা প্রসঙ্গে বাংলার বিপ্লবীদের কর্ম্ম কি করিলে বিস্তৃতিলাভ করে, তৎসম্বন্ধে গভীর আলোচনা করে। রাত্রি শেষ হয়—প্রদীপের শিখা কাঁপিয়া-কাঁপিয়া নির্ব্বাপিতপ্রায়। শ্রীশচন্দ্র রাত্রির আঁধারে আসে। রাত্রির আঁধার থাকিতেই চলিয়া যায়। তাহার ঘোর-কৃষ্ণ দেহকান্তি যেন রাত্রিরই অনুচর-মূর্ত্তি! আমি শেষ-রাত্রে গিয়া শয়ন করি।

শ্রীশচন্দ্র একদিন আসিয়া সংবাদ দিল যে, দুইজন তরুণ কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য মোজাফঃরপুর গিয়াছে। প্রস্তুতির অভাব হয় নাই। হেম দাসের বোমা এবং দুই জনের হাতেই দুইটী রিভলবার দেওয়া হইয়াছে। তাহার মুখেই শুনিলাম, এই দুইটী তরুণ প্রস্থানকালে অরবিন্দের চরণে প্রণত হইলে, তিনি তাহাদের মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ জানাইয়াছেন। কানাইলালের সহিত তাহারা সাক্ষাৎকার করিয়াছে। কানাইলাল দৃঢ়তার সহিত বলিয়া দিয়াছে—প্রাণের ভয় না রাখিতে। অব্যর্থ কর্ম্মসিদ্ধির পর যদি ধরাই পড়িতে হয়, আত্মনাশ সেই অবস্থায় অবশ্যই করণীয়। পুলিসের নির্য্যাতনে কোনরূপ দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইলে, বিপ্লবসংহতি ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।

আমি নীরব হইয়া শ্রীশন্দ্রের কথা শুনিলাম। আমার মনে বিপ্লবের বৃহত্তর চিত্র আঁকিয়া উঠিল। মনে হইল—ভারতের স্বাধীনতা অচিরেই সিদ্ধ হইবে—অসংখ্য তরুণ যখন স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষায় প্রাণ দিতে উদ্যত হইয়াছে। আর বারীন্দ্রকুমারের বৈপ্লবিক আয়োজন অতি বৃহৎ বলিয়াই ধারণা হইল। আশায়-উৎসাহে প্রাণ যেন দুলিয়া উঠিল।

'যুগান্তর' কাগজ পড়িয়া স্বাধীনতার আগুন মর্ম্মে-মর্ম্মে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। দেববত বসুর বিদ্যুল্লেখনী হৃদয়ে আশার বিদ্যুৎ ছুটাইত।

যোগা ক্ষ্যাপার চিঠি আমাদের মনে আলোড়ন তুলিত। 'ভাবের অমর বীর্য্য' শীর্ষক প্রবন্ধটী আজিও চিত্তক্ষেত্র হইতে মুছিতে পারি নাই। নব তান্ত্রিকের দল বাংলা বুঝি ছাইয়া ফেলিয়াছে! ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের শাসন অতি শীঘ্রই শেষ হইবে মনে হইল।

১লা মে। বৈশাখের উজ্জ্বল প্রভাতে উজ্জ্বল কালির অক্ষরে মোজা-ফঃরপুরে বোমা বিদীর্ণ হওয়ার কথা সংবাদপত্রসমূহে প্রচারিত হইল। উৎসাহে হৃদয় দুলিল। কিন্তু পরক্ষণেই কিংসফোর্ডকে হত্যা করিতে গিয়া মিসেস কেনেডির সহিত তদীয়া কন্যার প্রাণনাশের সংবাদে চিত্ত বিষণ্ণ হইল। ভাগ্যচক্রে কিংস্‌ফোর্ড সাহেব বাঁচিলেন। তাঁহারই গাড়ীতে চড়িয়া মিসেস্ কেনেডি কন্যাসহ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। গাডী লক্ষ্য করিয়া বোমা ছোঁড়া হইয়াছিল! কিন্তু নিহত হইলেন কিংসফোর্ড সাহেব নহে, দুইজন নিরপরাধা মহিলা। অদৃষ্টের পরিহাস! মাণিকতলার বিপ্লব প্রথম প্রচেষ্টায় অভিশপ্ত হইল।

দুইজন বিপ্লবী ধরা পড়িলেন। প্রফুল্ল চাকি আর ক্ষুদিরাম। প্রফুল্ল চাকি ভীম অগ্নিনালিকা বাহির করিয়া, নির্দ্দেশমত মুখগহ্বরে তালুতে লক্ষ্য করিলেন। ভীষণ গর্জ্জনে তাঁহার তালু বিদীর্ণ করিয়া গুলী ছুটিল। তিনি ধরাশায়ী হইলেন। প্রফুল্ল নেতার নির্দ্দেশ সর্ব্বতোভাবে পালন করিয়া মহাপ্রস্থান করিলেন। ক্ষুদিরামের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। পঞ্চদশ অথবা ষোড়শ বর্ষীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র আত্মনাশে অসমর্থ হইয়া পুলিসের হাতে ধরা পডিল। তাহার পর যাহা হইবার, তাহাই হইল।

নিশ্চযই পুলিসের পাশবিক অত্যাচারে তাহার মুখের যেটুকু স্বীকারোক্তি বাহির হইযাছিল, তাহার ফলেই পরদিন প্রভাতেই অর্থাৎ ২রা মে মুরারিপুকুর বাগান ঘেরাও করিয়া ৩৪ জন বিপ্লবীকে ধরা হইল। গোপীমোহন দত্তের গলি হইতে কানাইলাল ধরা পড়িল। আর

ধরা পড়িলেন 'বন্দেমাতরম্' দৈনিক সংবাদপত্রের প্রাণ-পুরুষ, বিপ্লব-যজ্ঞের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম-নেতা, জাতীয়তার মহান্ ঋষি শ্রীঅরবিন্দ। বাংলার আকাশ-বাতাসে আগুন জ্বলিয়া উঠিল—নিঃশ্বাসে-নিঃশ্বাসে বাঙ্গালীর প্রাণ উত্তপ্ত হইল। বাঙ্গালীজাতি শুনিল—জানিল বাংলার বিরাট্ বৈপ্লবিক আয়োজনের কথা। কেহ নিরাশ হইল, কেহ-বা আশার প্রদীপ জ্বালিয়া অতঃপর বিপ্লবীদের প্রচণ্ড আত্মপ্রকাশ লক্ষ্য করিতে লাগিল। আমরা চিন্তান্বিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—কেমন করিয়া বাংলার বিপ্লব আত্মরক্ষা করিবে!

সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশের সৃষ্টি হইল। চন্দননগরের বিপ্লব-কেন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত চারুচন্দ্র রায়কেও ফরাসী গভর্ণমেণ্ট বৃটিশ পুলিসের হাতে তুলিয়া দিলেন। মঁসিয়ে তার্দিভেল এইরূপে তাঁহার প্রতি বোমা-নিক্ষেপের প্রতিশোধ লইয়া এ দেশ ছাড়িয়া প্রস্থান করিলেন। পুলিসের দল চারুচন্দ্রকে ধৃত করিয়া একটী কৃষ্ণবর্ণ লঞ্চে তাঁহাকে তুলিয়া লইল। বাঁশী বাজিল। লঞ্চ দৃষ্টির বাহির হইল। চন্দননগরের বৈপ্লবিক যজ্ঞকুণ্ড ইহার ফলে অনেকখানি বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। কানাইলালের ন্যায় চারুবাবুর অন্যতম দক্ষিণ হস্ত ছিল শ্রীশচন্দ্র। তাহার চন্দননগরের বাহির হওয়া সম্ভবপর রহিল না। তখনও আমি জর্জ্জ হেণ্ডারসন কোম্পানীর কেরাণী। প্রতিদিন কলিকাতায় যাওয়া-আসা করি। বিপ্লবীরা পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইলে, শ্রীশচন্দ্রের নির্দ্দেশে বিশিষ্ট কয়েক জন প্রধান বিপ্লবীর সহিত আমায় দেখা করিতে হয়। সখারাম দেউস্কর আমাদের পরামর্শদাতা ছিলেন। আর ছিলেন ব্যারিষ্টার বি, সি, চট্টোপাধ্যায় ; ইনি শুধু পরামর্শই দিতেন না, বিপ্লবের কার্য্যে প্রত্যক্ষভাবেই সহায়তা করিতেন। কলিকাতার বহু ব্যবহারজীবীর সহিত পরামর্শ করিয়া ক্ষুদিরামের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করার ব্যবস্থা হইল। জেলে কয়েদীর সহিত সাক্ষাৎকার করার সুযোগ

লইয়া উকিল ক্ষুদিরামকে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করার কথা জানাই-লেন। ক্ষুদিরাম বীরের ন্যায় পুলিসের নিকট সকল উক্তি প্রকাশ্য আদালতে অস্বীকার করিলে, ইংরাজ বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িল। পুলিস-কর্ম্মচারিগণ অতঃপর শাসনের পরিবর্ত্তে বহু প্রলোভনে ক্ষুদিরামের স্বীকারোক্তি বজায় রাখার জন্য চেষ্টা করিল। ক্ষুদিরাম দৃঢ়পণে সমস্ত অস্বীকার করিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণের বিরাগভাজন হইল। সে বীরত্বপূর্ণ কাহিনী জাতি চিরস্মরণে রাখিবে। ক্ষুদিরামের ফাঁসী ঐতিহাসিক ঘটনা হইয়াই রহিল। বিপ্লব-যজ্ঞের বৃটিশ-দণ্ডে দণ্ডিত সর্ব্বপ্রথম শহীদ ক্ষুদিরাম বসু—স্বাধীন জাতির নিকট তাঁর নাম চিরপূজ্য হইয়া থাকিবে।

ধারারক্ষার আয়োজন

মাণিকতলা বাগানে বাংলার সর্ব্বপ্রথম বিপ্লব-দুর্গ ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট আবিষ্কার করিলে, উত্তেজনার আগুন দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। দেশের লোক প্রতি মুহূর্ত্তে এই ঘটনার পর চারিদিকে বিপ্লব-সংঘটনের প্রত্যাশা করিয়াছিল, কিন্তু সে আশা ক্রমেই নিভিয়া আসিতে লাগিল। বারীন্দ্র-কুমার, উপেন্দ্রনাথ, হৃষীকেশ, দেবব্রত, উল্লাসকর প্রভৃতি বিপ্লবীদের বন্দী করিয়া বাংলার বিপ্লবের শিকড় শুদ্ধ উপড়াইয়া ফেলার চেষ্টা হইল। নাড়াজোলের রাজা ধরা পড়িলেন। বাংলার প্রান্তে গিরিময় প্রদেশ হইতে এক করদ রাজ্যের রাজকুমার ধরা পড়িলেন। শ্রীরামপুরের কিশোরীলাল গোস্বামীর বাড়ী খানাতল্লাসী হওয়ায়, দেশব্যাপী চাঞ্চল্যের সীমা রহিল না। সকলে আরও বিস্মিত হইল—যখন জমিদারপুত্র নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ধৃত হইলেন। শ্রীরামপুর হইতে কলিকাতার পুলিস-কোর্ট পর্য্যন্ত তাঁহার কণ্ঠে উচ্চরবে “বন্দেমাতরম্” ধ্বনি উঠিল। উত্তরপাড়ার জমিদারপুত্র ধৃত হইলেন না বটে, কিন্তু

মিছরীবাবুর নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তিনিও যে একজন বিপ্লবীদের দলভুক্ত—একথা জানিতে কাহারও বাকী রহিল না। মাণিকতলা বাগানের কথা বাংলাদেশে উৎসাহের সহিত প্রচারিত হইতে লাগিল। কিন্তু কেন্দ্রের সন্ধান না পাইয়া, বহু তরুণ বিপ্লব-কর্ম্মে যোগদানে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেও, তাহারা নিরাশ হইয়া প্রতিদিন সংবাদপত্র পাঠ করিয়াই হৃদয়ের জ্বালা নির্ব্বাপিত করিল। ২রা মে, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে মাণিকতলা বাগানের সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পর যখন বাংলায় আর কোন বৈপ্লবিক কর্ম্ম প্রকাশ পাইতে দেখা গেল না, অনেকেই মনে করিলেন—বিপ্লব বাংলায় তেমন দৃঢ় শিকড় গাড়ে নাই, যে কয়েক জন তরুণ এই দুঃসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছে, তাহারা ধরা পড়ায় বাংলার বিপ্লব ব্যর্থ হইল। কিন্তু ১৫ই তারিখে গ্রে ষ্ট্রীটে ভীষণ বোমা বিদীর্ণ হওয়ার সংবাদ দৈনিক-পত্রসমূহে প্রকাশিত হইল। অনেকে ভাবিলেন—বন্দী বিপ্লবী ব্যতীত বাহিরেও তাঁহাদের সংখ্যা একেবারেই যে নাই তাহা নহে। আবার অনেকে ভাবিলেন, কিছু-কিছু বোমা যাঁহাদের বাড়ীতে সংরক্ষিত ছিল, তাঁহারা ভয় পাইয়া বোমাগুলি পথে-ঘাটে ফেলিয়া দিতেছে—গ্রে ষ্ট্রীটে বোমা বিদীর্ণ হওয়ার হেতু ইহা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। বস্তুতঃ বারীন্দ্রকুমারপ্রমুখ বিপ্লবিগণ এবং সঙ্গে-সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ ধৃত হওয়ায়, যে সকল বিপ্লবী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিলেন, তাঁহারা নেতার অভাবে অতঃপর কি করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। কেবল ইহার পর আসর গরম রাখিত মাঝে-মাঝে ইষ্ট বেঙ্গল রেলগাড়ীতে নারিকেল-বোমার বিস্ফোরণ-সংবাদ। কিংসফোর্ড সাহেব যেমন পুলিস-কোর্টের ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে স্বদেশীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া বহু কর্ম্মীকে দণ্ডিত করিয়াছিলেন, এই সময়ে হিউম সাহেবও হইয়াছিলেন তেমনি পুলিস-কোর্টের কুখ্যাত সরকারী উকিল—ইনি প্রতিদিন শিয়ালদহ হইতে বারাকপুরের রেলপথে যাতায়াত করিতেন। তাঁহাকেও হত্যা

করার প্রচেষ্টা চলিয়াছিল দীর্ঘদিন। সংবাদপত্রে ঘটা করিয়া নারিকেল-বোমা-বিস্ফোরণের সংবাদ বাহির হইত। বিপ্লবের আসর ইহাতেও কিছু-কিছু গরম থাকিত।

এই সময়ে ঢাকার "অনুশীলন সমিতি" বিশেষ কর্ম্মতৎপর হইয়াছিল। ২রা জুন তারিখে বিখ্যাত 'বরা ডাকাতি'র খবর বাহির হইলে, দেশ চমকিত হইয়া উঠে। একখানি বোটে ৫০ জন বিপ্লবী কোন ধনীর গৃহ লুণ্ঠন করিয়া যখন নদীপথে ফিরিতেছিল, বহু লোক তাহাদের ধরিবার জন্য নদীকূলে বোটের অনুসরণ করে। ইহাদের সহিত সারা রাত্রি পুলিসও এই বিপ্লবীদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে থাকে। বোট হইতে গুলীবর্ষণ হয়। চারি জন লোক নিহত হইলে, বোটের অনুসরণ করিতে কেহ আর প্রবৃত্ত না হওয়ায়, বিপ্লবীরা নিরাপদে গন্তব্য পথে চলিয়া যায়। ফরিদপুরেও ডাকাতির ধুম চলিতে থাকায়, বাংলাদেশে বিপ্লবের প্রাণ জাগিয়া থাকার প্রমাণ মিলে। কিন্তু আগষ্ট মাসে পুলিনবাবুও ধরা পড়েন। সুকুমার চক্রবর্ত্তী নামক এক বিপ্লবী যুবক তাঁহার সঙ্গেই ছিলেন; এই যুবকই পুলিনবাবুকে ধরাইয়া দিয়াছে—এইরূপ সন্দেহে তাহাকেও নিহত করা হয়। এই সকল সংবাদ বাংলায় বিপ্লব আন্দোলন জীয়াইয়া রাখে; কিন্তু তলে-তলে চন্দননগরে যে নিগূঢ় বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা সুরু হইয়াছিল, তাহার সংবাদ আজ পর্য্যন্ত গোপন রাখা হইয়াছে। ভারতের স্বাধীনতালাভের পর বৈপ্লবিক ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কোন কথা আর গোপন থাকা উচিত নহে বলিয়াই, পশ্চিম বঙ্গে নূতন বিপ্লব-কেন্দ্র-গঠনের যে অভিনব প্রয়াস হইয়াছিল, তাহাই এইখানে বর্ণনা করিতেছি।

মে মাসের মধ্যভাগে আমরা চারি ব্যক্তি চুঁচুঁড়া ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী তাৎকালীন আমাদের বাগানে উপস্থিত হইয়া মাণিকতলার অসমাপ্ত কর্ম্ম করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই। ইহাদের মধ্যে এক জন শ্রীশচন্দ্র ঘোষ।

দ্বিতীয় উত্তরপাড়ার স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। অন্য জন সখারাম দেউস্করের ভাগিনেয় বাবুরাম পরারকার। ইনি পরে কাশীর 'আজ' নামক দৈনিক পত্রের সম্পাদক হইয়াছিলেন। সম্প্রতি কাশীধামে তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন। শ্রীশচন্দ্রও আজ পরলোকে।

আমরা পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে এক বিশাল বকুল-বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া সেদিন এই প্রতিশ্রুতিই গ্রহণ করি যে, আমাদের মধ্যে শ্রীশচন্দ্র ঘোষ সন্ত্রাসবাদকে জীয়াইয়া রাখিবে। অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিপ্লবীদের সংহতি পুনর্গঠন করিবেন। বাবুরাম পরামর্শদাতা থাকিবেন। আর আমায় চন্দননগরে বসিয়া বিপ্লবের কর্ম্ম যাহাতে সকল দিক্ দিয়া সাফল্যমণ্ডিত হয়, সেই দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বারীন্দ্র-কুমারের লক্ষ্য ও আদর্শ যাহাতে ব্যর্থ না হয়—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াই সেদিন আমরা নিজ-নিজ গৃহাভিমুখে ফিরিলাম।

ভারতের স্বাধীনতানয়নের এই গুরু দায়িত্ব কর্ম্মে পরিণত করার জন্য যে অসাধারণ প্রচেষ্টা করা হইয়াছিল, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে সেই ইতিহাসটুকুই অতঃপর লেখনীমুখে প্রকাশ পাইবে।

বন্দিশালায় মুক্তি-পরিকল্পনা

শ্রীশচন্দ্র ঘোষ সর্ব্বপ্রথমে কানাইলালের সহিত জেলে সাক্ষাৎকার করার সুবিধা-সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। হঠাৎ সে একদিন আসিয়া আমায় জানাইল যে, জেলে গিয়া কানাইলালের সহিত সে সাক্ষাৎকার করিয়া আসিয়াছে। জেলে নিজেকে কানাইলালের আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া সে তাহার সহিত সাক্ষাৎকারের দরখাস্ত করে। কিছুক্ষণ পরেই জেলার তাহা মঞ্জুর করেন এবং অনায়াসেই কানাইলালের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার হয়।

অতিশয় ঔৎসুক্যের সহিত আমি এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ জানিতে চাহিলে, শ্রীশ বলিল "লোহার শিক-দেওয়া এক লম্বা প্রাচীরের অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বহু আত্মীয়-স্বজন বন্দীদের সহিত পরিচয় করার সুবিধা পায়। গোয়েন্দা-পুলিস পাশে-পাশেই দাঁড়াইয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের ফাঁকি দেওয়া খুবই সহজ। বিশেষতঃ জেলার যিনি, তিনি অতিশয় সদাশয় ব্যক্তি, জাতিতে ব্রাহ্মণ। তিনি দূরে টেবিলের পাশে চেয়ার পাতিয়া বসিয়া থাকেন। সেখানে তিনি কাগজপত্র লইয়া নাড়াচাড়া করেন। তাঁহার উদার মনোভাবজনিত অন্যমনস্কতার সৌজন্যে অনেক কথা আলোচনা করার সুযোগ মিলে। কানাইলাল তোমাকে একদিন সাক্ষাৎকার করার অনুযোগ জানাইয়াছে।"

আমি তখন জর্জ হেণ্ডারসন্ অফিসের নগণ্য কেরাণী। একদিন ছুটী লইয়া কানাইলালের সহিত সাক্ষাৎকার করার জন্য আবেদন-পত্র পাঠাইলাম। কিছুক্ষণ পরেই জেলারের অনুমতি পাওয়া গেল। যথাস্থানে গিয়া দেখিলাম—লোহার গরাদে-ঘেরা প্রাচীর-ব্যবধানে দুই শ্রেণীর লোক দাঁড়াইয়া অবাধে কথোপকথন করিতেছে। এক পার্শ্বে আত্মীয়-স্বজনেরা, অন্যপার্শ্বে কয়েদীরা পরস্পর হাস্য-পরিহাস-কথোপকথন করিতেছে। কানাইলাল আমাকে দেখিয়াই স্বভাবসুলভ হাস্যসহকারে বলিয়া উঠিল "এই যে মতিলাল, এখানে আসিয়া অবধি তোমায় দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছি। আশা করি—প্রতি সপ্তাহে দেখা দিবে।"

সেই দীর্ঘাকৃতি কানাইলাল, সেই সদাপ্রফুল্ল মুখশ্রী, হাস্যসুন্দর ওষ্ঠপুট, সুদীর্ঘ ললাট, প্রায় আজানুলম্বিত বাহু। তাহাকে দেখিয়া মনে হইল না যে, বন্দী অবস্থায় সে বিন্দুমাত্রও বিষণ্ণ হইয়াছে। সে আমায় চিনাইয়া দিল বারীন্দ্রকুমার, উপেন্দ্রনাথ, উল্লাসকর, হেমেন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র প্রভৃতিকে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "শ্রীঅরবিন্দ আসেন নাই?"

কানাইলাল বলিল "তিনি বড় কাহারও সহিত সাক্ষাৎকার করেন না—ধ্যানেই থাকেন—কথাবার্ত্তা কহেন না বলিলেই চলে।"

চারুচন্দ্র রায়ের কথা জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল "লোক আসিলে তিনি দেখা-সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু ধরা পড়ার পর তিনি খুব বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছেন। আমাদের কাহারও বড় সংসারের দুর্ভাবনা নাই। চারুবাবুর অবস্থা স্বতন্ত্র। তিনি বোধহয় পারিবারিক চিন্তায় বিব্রত আছেন।"

আমি অনেককেই দেখিলাম—স্বাধীনতা-ব্রতচারী যোগী পুরুষের ন্যায় ইঁহারা আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুগণের সহিত মুক্তচিত্তে হাস্যপরিহাস করিতেছেন। কানাইলাল অতঃপর গম্ভীর হইয়া আমায় বলিল, "মতিলাল, তোমার সহিত একটি কথা আছে।" সে একবার এদিক্-ওদিক্ চকিত নেত্রে চাহিয়া দেখিল, তারপর কহিল "আমরা বন্দী হইয়া থাকিতে চাহি না। কেবল জানিতে চাহি—বাহির হইতে তোমরা কিছু ব্যবস্থা করিতে পার কি-না!"

আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমরা কি করিতে চাহিতেছ?"

কানাইলাল বলিল "আমরা দলবদ্ধভাবে পলায়ন করিব। ভিতরের ব্যবস্থা শীঘ্রই হইবে। বাহিরে আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। একথা শ্রীশচন্দ্রকে জানাইও।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কেমন করিয়া পলাইবে?"

কানাইলাল বলিল "উপায়ের কথা পরে বলিব। বাহিরের আস্তানা ঠিক করিতে পারিলেই জেল হইতে বাহির হওয়া দুঃসাধ্য হইবে না।"

কানাইলালের কথাগুলি তরুণ মনের চাঞ্চল্য মনে করিয়া বলিলাম "শ্রীঅরবিন্দ, চারুবাবু ইহাতে রাজী আছেন?"

—"তাঁহারা রাজী নহেন। অনেকেই বাহির হইতে রাজী হইতেছেন না। বিশেষতঃ বারীন্দ্রকুমার, উপেন্দ্রনাথপ্রমুখ বিপ্লবের অগ্রণী যাঁহারা,

তাঁহারা আত্মকাহিনী প্রকাশ করায় অনেকে ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। বিপ্লবী বলিয়া যাঁহারা ধৃত, তাঁহাদের অপরাধ কোর্টের বিচারে প্রমাণিত হওয়া দুঃসাধ্য হইবে—এইরূপ অনেকের ধারণা। এই হেতু যাঁহারা স্বীকারোক্তি করিয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্য অনেকে সমর্থন করেন না। আমিও ইহার সমর্থক নহি। তবে দীর্ঘদিন কারাবন্দী থাকা এবং আন্দামান দর্শন করার জন্য আমি জন্মাই নাই। আমরা কয়েক জন পলাইবার ব্যবস্থা করিতেছি।"

কানাইলাল হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—পরে আবার বলিল "সে অতি সহজ কাজ। তোমরা শুধু আমাদের কিছুদিন লুকাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পার কি-না জানাইও।"

ঘণ্টা পড়িল—সাক্ষাৎকারের সময় শেষ হওয়ায়, ভাবিতে-ভাবিতে বাড়ী ফিরিলাম। শ্রীশচন্দ্রকে সকল কথা বলিলাম। শ্রীশচন্দ্র কানাই-লালের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎকারের পর যেরূপ দাঁড়ায়, তাহার জন্য আমায় প্রতীক্ষায় থাকিতে বলিল। এই সময়ে শ্রীশচন্দ্রের সহিত এক বন্ধুর অতিশয় সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছিল। তাঁহার নাম আমার স্মরণে নাই। কিন্তু তিনি মুরারিপুকুর বাগানেই থাকিতেন—ধরা পড়ার দিন সেখানে না থাকায়, অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন একজন খাঁটী বিপ্লবী। এমন দুঃসাহসিক কর্ম্ম ছিল না, যাহা তিনি করিতে অস্বীকার করিতেন। তিনি এই সংবাদ শুনিয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং প্রয়োজন হইলে সকল ব্যবস্থার ভার তিনি লইতে পারিবেন—এই আশ্বাস দিলেন।

আলিপুর মামলা সুরু হইল। বারীন্দ্রকুমারপ্রমুখ কয়েক জন নেতা মুক্তকণ্ঠে বিপ্লবের কথা ঘোষণা করিলেন। বারীন্দ্রকুমার ভাবিয়াছিলেন—তাঁহারা অবধারিত দণ্ডিত হইবেন। ভবিষ্যতের তরুণেরা তাঁহাদের কথায় প্রেরণা পাইবে এবং বিপ্লবের কার্য্য চালাইয়া যাইবে। শ্রীঅরবিন্দকে

জড়িত করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী রাজসাক্ষীরূপে কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া তাঁহার স্বীকারোক্তিতে অন্যান্য বন্দিগণের সহিত শ্রীঅরবিন্দকেও রেহাই দিলেন না। নরেন্দ্রনাথের উক্তি রাজকর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যসাধনে বিশেষ সহায় হইল।

এই ঘটনায় পর জেল হইতে পলাইবার প্রচেষ্টা হইতে সকলে বিরত হইলেন। নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্তের কথাই অনেকের মনে জাগিল। গভর্ণমেণ্টও সতর্ক হইলেন। বন্দীশালা হইতে নরেন্দ্রনাথকে চিকিৎসাভবনে রাখা হইল। ক্ষোভে-দুঃখে পিঞ্জরা-বদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় বিপ্লবীরা গর্জ্জন করিতে লাগিল। আমি, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ আর আমাদের উপরোক্ত বিপ্লবী বন্ধু কানাইলালের সহিত যথারীতি সাক্ষাৎকার করি। একদিন কানাইলাল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে আমায় জানাইল "মতিলাল, আমাদের দুইটী রিভলবার দিতে হইবে।"

আমি চিন্তিত হইয়া বলিলাম "জেলে রিভলবার দেওয়া খুবই শক্ত। আর রিভলবার লইয়া তোমরা করিবে কি? রাখিবে কোথায়?"

কানাইলাল দৃঢ়কণ্ঠে বলিল "সে ভাবনা যে আমরা না করিয়াছি, এমন নহে। আমাদের প্রচেষ্টার কথা শুনিযা শ্রীঅরবিন্দ নিষেধ করিয়াছেন। মাষ্টার মহাশয় অত্যন্ত ভয় পাইয়াছেন। কিন্তু বাংলার প্রথম বিশ্বাসঘাতক নরেন্দ্রনাথের রক্ত-পান না করিলে, আমার পিপাসা নিবৃত্ত হইবে না।"

কানাইলালের নিম্নের ওষ্ঠটি স্বভাবতঃই পুরু ছিল। দৃঢ়সঙ্কল্পে তাহা প্রস্তরের মত দেখাইলেও, আবেগভরে তাহা কম্পিত হইল। সে হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বলিল "শ্রীশচন্দ্রকে বলিও—এই ব্যবস্থা করিতেই হইবে।"

আমি চিন্তান্বিত ভাবে সেদিনের মত বাড়ী ফিরিলাম। শ্রীশচন্দ্রের সহিত সারা রাত্রি ধরিয়া পরামর্শ হইল। এই দুঃসাহসিক কর্ম্মে কানাইলালের কৃতসঙ্কল্প হওয়ার কথায় আমার দুর্ভাবনাই বাড়িল।

শ্রীশচন্দ্রের বৈপ্লবিক উৎসাহ কিন্তু অসাধারণ ছিল। সে সত্যই ছিল একজন খাঁটি বিপ্লবী। কানাইলালের সহিত সে আবার একদিন দেখা করিয়া আসিল। সে হাসিয়া বলিল, "ব্যাপারটা আদৌ শক্ত নয়। জেলার অমায়িক লোক। তিনি হেঁট মাথায় কর্ম্মের ভান করেন, বিপ্লবীদের দিকে দৃষ্টি রাখেন না। দর্শনার্থিদের পরীক্ষা করা হয় না। কথায়-কথায় সুযোগ লইয়া দুই-চারিটা রিভলভার জেলের মধ্যে পার করিয়া দেওয়া বেশী শক্ত কথা হইবে না।"

শ্রীশচন্দ্রের প্রফুল্লতা দেখিয়া বুঝিলাম যে, কানাইলালের উদ্দেশ্য সে সিদ্ধ করিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে দুইটী রিভলভার সংগৃহীত হইয়াছিল; সহজ কৌশলেই কানাইলালের হস্তে তাহা পৌঁছাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কোন অস্বাভাবিক অথবা দৈবনীতির আশ্রয় লইতে হয় নাই। তাহার প্রয়োজনও হয় নাই। জেলে কেমন করিয়া রিভলভার-সংগ্রহ হইল— ইহা আজিও রহস্যময়। কত কাহিনী এই উপলক্ষে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। শ্রীশচন্দ্র আজ পরলোকে। আমি আজিও জীবিত আছি। রিভলভার-প্রেরণের রহস্য আমাদের নিকট সরল ও সুস্পষ্ট। কানাইলাল ভারতের স্বাধীনতানয়নের একজন প্রধান ঋত্বিক্। সে চন্দননগরের মাটীতেই গড়িয়া উঠিয়াছিল, চন্দননগরেরই মানুষ তাহার অভীষ্ট পূর্ণ করিয়াছে।

রিভলভার হাতে লইয়া প্রহৃষ্টচিত্তে কানাইলাল কেবল জানাইয়াছিল "আমি মরিব—নরেনের রক্ত-তর্পণের কথা তোমরা সংবাদপত্রে পড়িও। কেবল একটী অনুরোধ—আমার মৃতদেহ বিপুল শোভাযাত্রা করিয়া যেন শ্মশানক্ষেত্রে নীত হয়। ইহা আমার মহিমা-প্রচারের জন্য নহে— মির্জ্জাফর, উমিচাঁদ যে-দেশে প্রাণধারণ করিয়াছে, সেই দেশে প্রথম মৃত্যুদণ্ড বিশ্বাসঘাতক আমাদের হাতে গ্রহণ করিল, ইহার গৌরব-মহিমা দেশ যেন উপলব্ধি করিতে পারে!"

প্রথম বিভীষণ-নিপাত

আকাশের ঘনঘটা কমিয়াছে। ভাদ্রের তীক্ষ্ণ সূর্য্যকিরণ সোণার বর্ণে দেখা দিয়াছে। কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথ অসুস্থ হইয়া জেলের হাসপাতালে পাশাপাশি শয্যা গ্রহণ করিল। সত্যেন্দ্রনাথ ডাকিয়া পাঠাইল নরেন্দ্রনাথকে তাহার রোগশয্যায়। আর একজন সহকর্ম্মী নরেন্দ্রনাথের সমর্থক হইবে—এই আশা তাহাকে ছুটাইয়া আনিয়াছিল সত্যেনের সন্নিধানে। শেষদিন সাক্ষাৎকার-কালে হঠাৎ ঝলসিয়া উঠিল ভীষণ অগ্নিনালিকা! বজ্রগর্জ্জনের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ গুলীবিদ্ধ হইল। প্রাণভয়ে পলায়নতৎপর হইলে, সত্যেন্দ্রনাথের হস্তে রিভলভার অগ্নি উদ্গিরণ করিয়া, বুলেট ছুঁড়িল নরেন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করিয়া। নরেন্দ্র পাশ কাটাইয়া ছুটিল উর্দ্ধশ্বাসে। ততক্ষণে কানাইও বাহির হইয়া পড়িয়াছে রিভলভার হস্তে। গুলীর আঘাতে নরেন এক পয়ঃপ্রণালীর পার্শ্বে পড়িয়া গেল। কানাইলাল তাহার বুকে বসিয়া তাহার শেষ আয়ুঃটুকু কাড়িয়া লইল। জ্বরাক্রান্ত কানাইলালের গায়ের উত্তাপ তখন ১০৫° ডিগ্রী।

সংবাদপত্রে আলিপুর জেলের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড প্রচারিত হইল। কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথের জয় দিল দেশবাসী। চন্দননগরবাসী গর্ব্বোন্নত শিরে হাঁকিল—"আমাদের কানাইলালের এই কীর্ত্তি!" ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর বিপ্লবেতিহাসের পৃষ্ঠায় রক্তাক্ষরে লেখা থাকিবে—বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে স্বাধীনতান্দোলনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার প্রথম বিশ্বাসঘাতক বিপ্লবী শহীদের হস্তেই নিপতিত হইয়াছে।

মৃত্যুঞ্জয়ী

কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথের বিচারের ফল বাহির হইল। উভয়েই ফাঁসীদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। অপরাধ অস্বীকার করিবার কথা উঠে

নাই। ফাঁসীর হুকুম নূতন মনে হইল না—আমরা সেই মহাদিনের অপেক্ষায় রহিলাম।

১০ই নভেম্বর, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ—কানাইলালের ফাঁসীর দিন স্থির হইয়াছিল। তারপর হইবে সত্যেন্দ্রনাথের ফাঁসী। সত্যেনের ফাঁসীর রায় মকুব করার চেষ্টা তাহার আত্মীয়েরা করিয়াছিলেন। কানাইলাল মরণের জন্য প্রস্তুত ছিল বলিয়াই তাহার ফাঁসী অগ্রে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা হইল।

কানাইলালের সহিত সাক্ষাৎকারের আর সুযোগ রহিল না। মরণের পূর্ব্বে সে কাহার সহিত দেখা কবিতে চায়—এই কথা জিজ্ঞাসিত হইলে, তদুত্তরে সে কোন আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ করে নাই। কানাইলালের ইহজীবনের যে প্রয়োজন ছিল, তাহা সে সম্পূর্ণ ভাবে সমাপ্ত করিয়াছে বলিয়া, তাহার অন্তরে তৃপ্তির অবধি ছিল না। তাহাদের আইরিশ জেল-ওয়ার্ডার তাহার হাস্যোদ্দীপ্ত বদনের দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইত। সে কানাইলালকে বলিয়াছিল যে, কানাইলাল ফাঁসীমঞ্চে আরোহণ করিলে মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া তাঁহার অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা দেখিবার জন্য সে প্রতীক্ষা করিবে। কানাইলাল তাহার কথা শুনিয়া মৃদুহাস্যে বলিয়াছিল "মৃত্যুকে আমি ভয় করি না। আমার কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইয়াছে, আমি হাসিতে-হাসিতে ফাঁসীর দড়ি গলায় পরিব।"

একমাত্র কানাইলালের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ শ্রীআশুতোষ দত্ত এই সময়ে কানাইলালের সহিত জেলে গিয়া সাক্ষাৎকারের অনুমতি লাভ করিয়াছিলেন। আশুবাবুর মুখে আমরা শুনিলাম যে, ফাঁসীর হুকুমের পর কানাইলাল শুধু ম্যালেরিয়া-জ্বর-মুক্তই হয় নাই, তার দেহের ওজনও পাঁচ পাউণ্ড বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার হর্ষোৎফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া অধিক কথা বলার সাহস আশুবাবুর হয় নাই। কানাইলাল উৎফুল্ল; মরণের প্রতীক্ষায় সে নিশ্চিন্ত চিত্তে অপেক্ষা করিতেছে।

সংসারের প্রতি তাহার বিন্দুমাত্র মমতা নাই। কানাইলাল বিধবা মাতাকে প্রণাম জানাইয়াছে, অনূঢ়া ভগ্নীগুলির শুভ কামনা করিয়াছে। অধিকন্তু সে বলিয়া দিয়াছে আমাকে জানাইতে, যেন তাহার মৃত্যুর পরে তাহার শবদেহ লইয়া যোগ্য শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করা হয়। আমি এই অবস্থায় নিজেকে নিরুপায় মনে করিলাম। নরেন্দ্রনাথের হত্যার পর ইংরাজের দোর্দ্দণ্ড শাসন আরও রুদ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। কানাই-লালের প্রতিষ্ঠিত সমিতিতে তরুণেরা লাঠীখেলায় যোগ দিতে আর আসিত না। অভিভাবকদের কড়া শাসনে পল্লী-যুবকেরা সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

আমি কানাইলালের অগ্রজের সহিত পরামর্শ করিয়া ৯ই নভেম্বর কলিকাতায় আসিলাম। আশুবাবুর সহিত চন্দননগরবাসী এক আত্মীয় সঙ্গে আসিয়াছিলেন। বাসায় আসিয়া জুটিলেন শ্রীরামপুরের আশুতোষ দাস, কানাইলালের ভাগিনেয়। আজ ইনি পরলোকে। ইনি যোগ্যতার সহিত এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, পরে হরিপালে দেশ-সেবায় আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ৺আশুতোষ দাসের পরিচয় বাঙ্গালী জাতি সগৌরবে রক্ষা করিবে। তাঁহার ন্যায় সর্ব্বহারা দেশকর্ম্মী বাঙ্গালী জাতির মধ্যে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ডাঃ আশুতোষ দত্তের এই কার্য্যে প্রধান আশ্রয় ছিলাম আমি। আমরা রাত্রে দেশী লালপেড়ে ধুতি, চাদর, পুষ্পমাল্য প্রভৃতি খরিদ করিলাম। কানাইলালের পরিধানের জন্য ধুতি ও চাদর যত্নের সহিত কোঁচান হইল। ভোর হইতেই আমরা পথে বাহির হইলাম। হকারের হাতে বিজ্ঞাপন ঝুলিতেছে—তাহাতে রক্তাক্ষরে লিখিত আছে—সাব্ ইন্‌স্পেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জ্জির হত্যা-সংবাদ।

বুঝিলাম—মাণিকতলার কর্ম্মসূত্র ধরিয়া আমরাই শুধু সংহতিবদ্ধ নহি, কলিকাতায় বিপ্লব-সংহতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আততায়ি-নিধনে উদ্যত

আছে। সে দিনও এই সকল বিপ্লবীদের সহিত আমাদের পরিচয় হয় নাই। কানাইলালের মৃত্যুর পর কলিকাতার বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত, হরিশচন্দ্র সিকদার প্রভৃতির সহিত পরিচয়ের সুযোগ ঘটে। কিংসফোর্ড সাহেবের হত্যা-প্রচেষ্টায় ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকি বোমা বিদীর্ণ করার পর যখন তাঁহারা আত্মগোপনের প্রয়াস করিয়াছিল, তখন নন্দলাল ব্যানার্জ্জিই তাহাদের অনুধাবন করেন। প্রফুল্লকুমার ধৃত হন। পরিশেষে এই নন্দলালের রক্তদর্শন করিয়া, বাংলার বিপ্লবীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলেন। সন্ত্রাসবাদের ঘোরকৃষ্ণ ছায়াপাত হইল গোয়েন্দা-বিভাগের উপর। নরেন্দ্রনাথের হত্যার পর, ইন্‌স্পেক্টর নন্দলালের মৃত্যুসংবাদ কানাইলালের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করার যাত্রাপথে শুভ লক্ষণ বলিয়াই মনে হইল। আমরা একটি দ্রুতগামী গাড়ী ভাড়া করিয়া আলিপুর জেলের দিকে রওনা হইলাম।

জেলের ফটকে যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার দুর্ভাবনা দূর হইল। দেখিলাম—উৎসাহী তরুণের দল কাতারে-কাতারে জেলের ফটকে উপস্থিত হইয়াছেন। কানাইলাল চাহিয়াছিল তাহার শব-দেহ লইয়া যোগ্য শোভাযাত্রা। তাহা সুসম্পন্ন হইবে বলিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।

জেলের ফটকের দিকে আমাদের গাড়ীখানি অগ্রসর হইতেই, সমবেত জনমণ্ডলী বুঝিয়া লইল—আমরাই কানাইলালের আত্মীয়, চন্দননগর হইতে আসিতেছি। বিশাল সমুদ্রের উত্তাল জনতরঙ্গ আমাদের পথ করিয়া দিল। জলদ-গর্জ্জনে ধ্বনি উঠিল—"বন্দেমাতরম্"।

চতুর্দ্দিকে পুলিস-প্রহরী মোতায়েন ছিল। শান্তি-ভঙ্গের আশঙ্কায় রেগুলেশন লাঠী লইয়া শান্তিরক্ষকের দল এবং ফোর্ট উইলিয়াম হইতে একদল সশস্ত্র বৃটিশ সৈনিক ঘটনা-ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল। আমরা ফটকের

সম্মুখে উপস্থিত হওয়া মাত্র সশস্ত্র প্রহরীবেষ্টিত তদানীন্তন পুলিস কমিশনার হ্যালিডে সাহেব, আলিপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং অন্যান্য পুলিস কর্তৃপক্ষগণ রুক্ষভাষায় আমাদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিলেন। হ্যালিডে সাহেব এক বাঙ্গালী গোয়েন্দা পুলিসকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ডাঃ আশুতোষ দত্ত কোন্ ব্যক্তি ?" আশুবাবুর পরিচয় তিনি সহজেই পাইলেন। তারপর আশুবাবুকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহাদের সহিত সম্বন্ধ কি ?" আশুবাবু আমাদের সকলকেই নিকটাত্মীয় বলিয়া স্বীকার করিলে, আমাদের জেল-ফটকের ভিতর প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল। প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলে, হ্যালিডে সাহেব উদ্ধত কণ্ঠে বলিলেন—"আমরা মাত্র দুইজনকে জেলের ভিতর প্রবেশ করিতে দিব। আপনারা কে-কে জেলের ভিতর প্রবেশ করিবেন ?"

আশুবাবু আমাকে লইয়া জেলের অন্তঃপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। ওয়ার্ডারদের সঙ্কেতে আমরা এক সেলের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কি দেখিলাম ? অপ্রশস্ত কক্ষে মেঝের উপর আপাদমস্তকে কম্বলে মোড়া কানাইলালের মৃতদেহ রক্ষা করা হইয়াছে। আশুবাবু অশ্রু-সংবরণে অসমর্থ হইলেন। আমার চক্ষে অশ্রু নির্গত হইল না। জ্বালাময় অগ্নিশিখায় নয়ন দুটি জ্বলিয়া উঠিল। ইতস্ততঃ চাহিতেই দেখিলাম—কয়েক জন দেশীয় ওয়ার্ডারের সঙ্গে একজন শ্বেতাঙ্গ ওয়ার্ডার। এই ব্যক্তি কানাইলালের সেলে পাহারা দিত। ফাঁসীর হুকুম হওয়ার পর কানাইলালকে উৎফুল্ল দেখিয়া এবং তাহার দিন-দিন ওজন বৃদ্ধি হওয়ায় এই আইরিশ ওয়ার্ডারই কানাইলালকে বলিয়াছিল—"ফাঁসী কাষ্ঠে আরোহণ করার কালে তোমার এই স্ফূর্তি কি আকার গ্রহণ করিবে, তাহা দেখিব !"

দেখিলাম সেই আইরিশ ওয়ার্ডারের চক্ষে জল ঝরিতেছে। আশু-বাবুর করমর্দ্দন করিয়া সে বলিল "মিঃ দত্ত, আপনি কাঁদিবেন না।

আপনার ভাই একজন খাঁটী বীর এবং এত বড় নির্ভীক দেশপ্রেমিক আয়ার্ল্যাণ্ডেও অধিক মিলিবে না।"

এই আইরিশ ওয়ার্ডার চক্ষের জল মুছিতে-মুছিতে আমাদের কানাই-লালের অন্তিম কাহিনী বর্ণনা করিল। তাহারই মুখে শুনিলাম—"নরেন গোঁসাইয়ের হত্যার পর কানাইলালের ১০৫° ডিগ্রী জ্বর উঠিয়াছিল। তারপর জ্বরের বিরাম হইলে, তাঁহাকে ডাক্তার কুইনাইন দিতে চাহিলে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। সেই ক্ষুদ্র কক্ষে তিনি সিংহের মত সর্ব্বদাই পদচারণা করিতেন। আর তাঁহার জ্বর হয় নাই। তাঁহার মুখে হাসি সর্ব্বদাই দেখিতাম।" সে আরও বলিল "আমি তাঁহাকে কহিয়াছিলাম ফাঁসীর সময়ে এই হাসি তাঁহার থাকিবে না।" কিন্তু ফাঁসীকাষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাঁহার চক্ষুঃ যখন আবৃত করা হইতেছিল, হাসিতে-হাসিতেই তিনি আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"তুমি আমায় এখন কেমন দেখিতেছ ?"

আইরিশ ওয়ার্ডার ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—"গলার ফাঁসী কিছু কঠিন বোধ হওয়ায়, তিনি নিজেই তাহা ঠিক করিয়া লইলেন। তারপর তাঁহার মুখে আর কথা সরিল না !"

আশুবাবুও রোদন সংবরণ করিতে পারিলেন না।

আমরা কানাইলালের সেলে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে কম্বলটীর অপসারণে প্রবৃত্ত হইলাম। ওয়ার্ডারগণ 'হাঁ-হাঁ' করিয়া উঠিল। তাহাদের প্রতি হুকুম আছে—এই অবস্থায়ই জেলের বহিঃপ্রাঙ্গণে শবদেহ লইয়া যাইতে হইবে। পুলিস-কমিশনারের সম্মুখেই শবের দেহাবরণ মুক্ত করিতে হইবে। আমি তদনুযায়ী কয়েক জন ওয়ার্ডারের সাহায্যে কম্বলমণ্ডিত কানাইলালের শবদেহ বুকে করিয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তারপর কমিশনারের সম্মুখে কানাইলালের অঙ্গাবরণ মুক্ত করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহার বর্ণনার ভাষা আমার নাই !

দেখিলাম—কণ্ঠের দুই পার্শ্বের অস্থি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কানাই-লালের দৃষ্টি উন্মীলিত। ওষ্ঠপুটে দন্ত রাখিয়া তাহার দৃঢ়তাব্যঞ্জক বদনমণ্ডল মৃত্যুঞ্জয়ী রুদ্রের মত শোভা পাইতেছে। আমি তাহার ললাট হইতে কেশগুচ্ছ অপসারিত করিয়া, তাহার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিলাম। তারপর দৃষ্টি পড়িল দীর্ঘ দেহযষ্ঠির উপর। কানাই-লালের বাহু দুটী ছিল আজানুলম্বিত। ইহা এতদিন লক্ষ্যে পড়ে নাই। আজ তাহার দীর্ঘ সুবিস্তৃত বাহুদ্বয় লক্ষ্য করিলাম! তাহার হাত দুটী মুষ্টিবদ্ধ। মরণের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ার ইহা লক্ষণ অথবা ভারত নিশ্চয় স্বাধীন হইবে, এই দৃঢ়প্রত্যেয়ে সে মৃত্যুকে বরণ করিয়াছে! কানাইলাল চিরদিনই হাতের ও পায়ের নখরগুলি দীর্ঘ রাখিত। আজ সেগুলি আরও দীর্ঘাকৃতি হইয়াছে। কানাইলালের সেই বীরসজ্জা আজিও হৃদয় হইতে আমি মুছিতে পারি নাই। ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই বীর শহিদ আমার মনে চিরজাগ্রত থাকিবে।

ডাঃ আশুতোষ দত্ত ভ্রাতার মৃতদেহের দিকে চাহিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। হ্যালিডে সাহেব তাড়া দিয়া বলিলেন "শব দীর্ঘক্ষণ এইভাবে থাকিতে পারে না, শীঘ্র ব্যবস্থা করুন।"

আমি অপর দুইজন বন্ধুর সাহায্যে কোঁচান ধুতিখানি কানাইলালকে পরাইলাম। কোঁচান চাদর গলদেশে লম্বমান করিয়া পুষ্পমাল্যে তাহাকে বিভূষিত করিলাম। ললাটে চন্দন লেপন করিয়া তাহার বর-মূর্ত্তি শয্যাধারে উঠাইয়া লইলাম। তারপর হরিধ্বনি করিয়া ফটকের দিকে অগ্রসর হইবার উপক্রম করা মাত্র হ্যালিডে সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন "শবের মুখ অনাবৃত রাখিয়া শবযাত্রা করিতে দিব না। আর এ পথে আপনাদের গমন নিষিদ্ধ। আপনারা জেলের পশ্চাদ্দ্বার দিয়া বহির্গমন করুন।"

কানাইলালের অগ্রজ আশুতোষ বিহ্বল, বিমূঢ়। তিনি ক্রূরমূর্ত্তি হ্যালিডে সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি উদ্ধত কণ্ঠে বলিলাম "কানাইলালের মুখে আমরা কোনই আবরণ দিব না এবং প্রশস্ত পথ দিয়াই শবযাত্রা করিব।"

এই কথা শুনিয়া হ্যালিডে সাহেব রুষ্ট হইয়া বলিলেন "আপনার নাম কি?"

আমি গর্ব্বের সহিত নিজের নাম বলিলাম। হ্যালিডে সাহেব একজন বাঙ্গালী পুলিস কর্ম্মচারীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "ইহার নাম লিখিয়া রাখ।" তারপর বল-দর্পিত অঙ্গুলী-সঙ্কেতে জেলের পশ্চাৎ দিক্ দেখাইয়া তিনি বলিলেন "এই দিক্ দিয়া শব লইয়া যাও। আর শবের মুখ আবৃত করা হোক।"

আমার জিদ বাড়িল। আমি বলিলাম "ইহা কিছুতেই হইবে না। কানাইলালের মৃত্যুদণ্ডেও আপনাদের ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই! মৃত্যুর পর আমরা ইচ্ছামত তাহার শবদেহ শ্মশানে লইয়া যাইব—ইহাতে আপত্তি করা সঙ্গত নহে।"

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার বাড়ী কোথায়?" আমি বলিলাম "চন্দননগর"।

তিনি রূঢ় ভাষায় বলিলেন "ইহা চন্দননগর নহে, আলিপুর মনে রাখিবেন। আমার আদেশ অমান্য করিলে, এইখানেই শবদেহ রাখিয়া আপনাকে বন্দী হইতে হইবে।"

যৌবনের শোণিতপ্রবাহ উজানে বহিল। কি বলিতে যাইতে-ছিলাম—আশুবাবু অনুরোধ জানাইলেন "বিবাদে প্রয়োজন নাই—সাহেব যাহা বলিতেছেন, তাহাই পালন করুন।"

অবস্থা বুঝিয়া নীরব রহিলাম। কানাইলালের উল্লসিত মুখমণ্ডলে বস্ত্রাবরণ দিয়া জেলের পশ্চাৎপথে পা বাড়াইতে হইল। কিছুদূর গিয়া

দেখি—সারি-সারি পায়খানার বিষ্ঠাহ্রদ সৃষ্ট হইয়াছে। ইংরেজের অনুগ্রহ-স্মরণে নাকে কাপড় দিয়া—বামে আদিগঙ্গা, দক্ষিণে পায়খানা-শ্রেণী রাখিয়া, অতি অপ্রশস্ত পথ দিয়া আমরা জেলের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বিশাল জনসমুদ্র সদর-ফটক দিয়া শবদেহ লইয়া যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা শুনিয়া, জেলের পশ্চাৎ প্রশস্ত রাজপথে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। আমরা জেল সীমা অতিক্রম করিতেই তুমুল ধ্বনি উঠিল "বন্দেমাতরম্"। লক্ষ-লক্ষ লোকের শোভাযাত্রা। সে অপূর্ব্ব দৃশ্য যাঁহারা সন্দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা সেই স্মৃতি কোন দিন মন হইতে মুছিতে পারিবেন না। কয়েক জন ইংরাজ পুলিস শবযাত্রার অনুগমন করিতেছিলেন। জনগণের উৎসাহ-দর্শনে সম্ভবতঃ তাঁহাদের মধ্যে একজন আত্মবিস্মৃত হইয়াই বলিলেন "শবের মুখ হইতে বস্ত্রাবরণ দূর করিয়া দিন।"

আমি তাহাই করিলাম। চতুর্দ্দিক্ হইতে পুষ্পমাল্য ও পুষ্পগুচ্ছ শবাধারে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তরুণের দল আসিয়া শবাধার বহন করিতে চাহিল। পথের দুই ধারে অগণন দেশবাসী দাঁড়াইয়া জয়-রবে দিঙ্মণ্ডল ধ্বনিত করিল। পথের উভয় পার্শ্বে অলিন্দ হইতে কুলকামিনী-গণ হুলুধ্বনির সঙ্গে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। বিপুল উত্তেজনার মধ্যে আমরা কেওড়াতলার শশ্মানঘাটে উপস্থিত হইলাম। এমন জনসমাগম জীবনে লক্ষ্য করি নাই। জাতীয়তাবোধে উন্মত্ত আবালবৃদ্ধ-বনিতা কানাইলালের চরণ-স্পর্শের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করায়, আমরা শ্রেণীবদ্ধ স্বেচ্ছাসেবক দাঁড় করাইয়া প্রশস্ত পথ রচনা করিলাম। গীতা উপহার কানাইলালের শবদেহ আচ্ছন্ন করিল। পুষ্পমাল্যের স্তূপ-রচনা হইল। কানাইলালের চরণ চুম্বন করিয়া কত নারীপুরুষ যে এমন বীর পুত্রের পিতামাতা হওয়ার সৌভাগ্য-কামনা উচ্চারণ করিল তাহা বর্ণনা করার নহে।

আমরা শবদেহ শ্মশানে আনিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিলাম। কাহারা যে প্রশস্ত চুল্লী কাটিল, ভারে-ভারে চন্দনকাষ্ঠ আনিল—তাহার সন্ধান কে রাখে! শবদেহ চিতার উপর রক্ষা করিয়া জনগণের অনুরোধে সেই দিন আমায় শহীদ কানাইলালের জীবনবৃত্তান্ত উদাত্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করিতে হয়। একখানি উন্নত টুলের উপর দাঁড়াইয়া সেই দিন দেখিয়াছি—অসংখ্য নরনারী স্বাধীনতার অগ্রপুরোহিত কানাইলালের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনের জন্য উপস্থিত হইয়াছে। আমার কণ্ঠে এত অগ্নি ছিল, এত ভাষা ছিল—সেইদিন তাহার প্রমাণ পাইলাম! লক্ষ-লক্ষ নরনারী নীরবে আমার কণ্ঠধ্বনি শুনিল। তারপর উচ্চারণ করিল তুমুল রবে "বন্দেমাতরম্"।

কানাইলালের চিতা জ্বলিল। চন্দনকাষ্ঠ ভারে-ভারে আসিয়া চুল্লীকে নিভিতে দিল না। হেমন্তের মধ্যাহ্ন মাথার উপর দিয়া বহিয়া গেল। অপরাহ্ন আসিয়া দেখা দিল। কানাইলালের চুল্লী নিভিতে চাহে না, ধু-ধু করিয়া জ্বলিতেছে। মাঝে-মাঝে হরিধ্বনির সহিত তরুণ কণ্ঠে "বন্দেমাতরম্" শব্দ উঠিতেছে। লক্ষ-লক্ষ নরনারী নীরবে প্রজ্জ্বলিত চুল্লীর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সূর্য্য অস্তগামী হয়—আশুবাবু বিদায় প্রার্থনা জানাইলেন। চুল্লী নিভিল, কিন্তু কানাইলালের অস্থি খুঁজিয়া পাইলাম না। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র হাড়ের টুকুরা খুঁজিয়া বাহির করিতে সমবেত জনতা প্রবৃত্ত হইল। আমরা কানাইলালের চিতাভস্ম আদি-গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়া কানাইলালের শেষকৃত্য সমাপ্ত করিলাম।

আদি-গঙ্গার অপর তীরে বিপুল সেনাসন্নিবেশ লক্ষ্য করিলাম। ইংরাজের এই কঠোর শাসনযন্ত্রে আঘাত দিয়া কানাইলাল চিরপ্রস্থান করিল। আমরা সেদিন কালীঘাটের কয়েক জন সেবকের আতিথ্য হইতে মুক্তি পাই নাই। অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহাদের সমিতিতে কিঞ্চিৎ খাদ্যাদি গ্রহণ করিয়া, কানাইলালকে চিরবিদায় দিয়া গৃহে ফিরিলাম।

এক প্রহর রাত্রিতে কানাইলালের বিধবা মাতা যখন আমাদের প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ পাইলেন, সেই পুত্রশোকাতুরা জননীর আর্ত্তনাদ আজিও আমার কাণে বাজিতেছে। বীরপুত্রপ্রসবিনী জননীর চরণে প্রণাম করিয়া আমরা বাড়ী ফিরিলাম। মৃত্যুঞ্জয়ী বীর আমাদের ললাটে বিপ্লবের রক্তটীকা পরাইয়া চিরপ্রস্থান করিয়াছে। সে স্বাধীনতার কামনা আজ অংশতঃ পূর্ণ হইয়াছে। কানাইলালের আত্মা কি তাহাতে তৃপ্তি পাইয়াছে?

বিচারের রায়

কানাইলালকে বিসর্জ্জন দিয়া ঘরে ফিরিলাম। এই সময়েই চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া আমি ব্যবসায়ে মন দিলাম। কিন্তু বিপ্লবের দিকেই ঝোক অধিক থাকায়, ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে পারিলাম না। বাংলার বিপ্লব-যজ্ঞ পূর্ণাঙ্গ যাহাতে হয়, সেই চেষ্টাই বড় হইয়া উঠিল।

আলিপুর মামলা জোর চলিয়াছে। ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন অরবিন্দের পক্ষ লইয়া জেরা সুরু করিয়াছেন। দৈনিক পত্রিকা পড়ার ধূম পড়িয়াছে। ঘরে-ঘরে আলিপুর বোমার মামলার কথা লইয়া আলোচনা হয়।

১০ই নভেম্বর কানাইলালের ফাঁসী হয়। তাহার কয়েক দিন পরেই ঢাকায় সুকুমার চক্রবর্ত্তীর নিধন-বার্ত্তা সংবাদপত্রে বাহির হওয়ায়, বাংলার বিপ্লবাগ্নি যে নিভে নাই, এই ধারণা দেশবাসীর হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল। ঢাকা অনুশীলন সমিতির ঘরের কথা প্রকাশ করিয়া দেওয়ার ফলে সুকুমারের জীবননাশ, ইহা বিশ্বাসঘাতকের উপযুক্ত দণ্ড বলিয়া সকলের মনেই আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করিল। তারপরই হাওড়ায় আর একজন গৃহশত্রুর নিধান-বার্ত্তা সংবাদপত্রে প্রকাশ পাইল। কেশব-চন্দ্র দে নামক এরূপ এক ব্যক্তি বিপ্লবীর হস্তে নিহত হওয়ায়, বাংলার

বিপ্লবীদের মন উৎসাহ-চঞ্চল হইয়া উঠিল। চন্দননগরে গুপ্ত-সমিতির প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর বিপ্লব-সংহতির বিস্তৃতির আয়োজন চলিতেছিল। বাহিরের সহিত তখনও কোন সংযোগ-স্থাপন হয় নাই। কলিকাতার শ্যামবাজারে যতীন্দ্রমোহন রক্ষিত চন্দননগর-সমিতির একজন অন্তরঙ্গ পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিল। শ্রীশচন্দ্র ইহার সহিত সংযোগ রক্ষা করিল। হাওড়ায় কেশব দে'র নিধন-বার্ত্তা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ঢাকায় আনন্দ ঘোষ নিহত হওয়ার সংবাদ বাহির হইল। বাংলায় সেইদিন অন্তর্দ্রোহীদের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসারিত করার সঙ্কল্পই সিদ্ধ করা হইতেছিল। তারপর ২৯শে নভেম্বর নদীয়ার ডাকাতির সংবাদ বাহির হওয়ায়, বুঝা গেল যে, শুধু কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়াই বিপ্লব-সংহতি গড়িয়া উঠে নাই, বাংলার সর্ব্বত্র বিপ্লবের বীজ বপন করা হইয়াছে। ঢাকায় "অনুশীলন-সমিতি" সর্ব্বপ্রধান বিপ্লবকেন্দ্র-রূপে গড়িয়া উঠিলেও "স্বদেশবান্ধব-সমিতি" নামে আর একটী বিপ্লব-দলও সেখানে দেখা দিয়াছিল। বাখরগঞ্জে "ব্রতী-সমিতি" বিপ্লবের পথে অগ্রসর হইতেছিল। ফরিদপুরে "সুহৃৎ-সমিতি" ও ময়মনসিংহে "সাধনা-সমিতি" দেশের তরুণদের হইয়া দল বাঁধিতেছিল। পশ্চিমবঙ্গেরও সর্ব্বত্র ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দলের বৈপ্লবিক কর্ম্মে অগ্রসর হওয়ার সংবাদ যতই প্রকাশিত হইত, ততই দেশবাসী আনন্দে উদ্বুদ্ধ হইত। স্বাধীনতাকামী এই সকল তরুণের প্রচেষ্টায় বাংলার প্রতি সমগ্র ভারতের দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল। বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশেও বিপ্লব-সমিতি গড়িয়া উঠার সংবাদ পাওয়া যাইত। নদীয়া ডাকাতির পরে, ডিসেম্বর মাসেই হুগলী জেলায় রাষ্ট্রনীতিক ডাকাতির সংবাদ সকলকেই বিস্মিত করিল। পুলিসের শক্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করিয়া ষড়যন্ত্রকারীদের উচ্ছেদসাধনে ইংরাজ কৃতসঙ্কল্প

হইল। কিন্তু ইহাতে সে প্রবল জলতরঙ্গ-রোধ করা সম্ভবপর হইল না। আলিপুর বোমার মামলাও ঘোরাল হইয়া উঠিয়াছিল। সংবাদপত্রে নানারূপ খবর বাহির হইত। দায়রা জজ বিচক্রফট্ সাহেবের আদালতে বন্দীদের বিচিত্র আচরণের কথা অতিশয় মনোযোগ দিয়া আমরা পাঠ করিতাম। একদিকে চিত্তরঞ্জন অরবিন্দের মুক্তিকামনায় জোর জেরা করিতেছেন। আসামী পক্ষে বহু উকিল-ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হইয়াছেন। অন্যদিকে শাসকপক্ষের আশুতোষ বিশ্বাস আসামীদের দোষী সাব্যস্ত করিতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। আসামীদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন যে সকল ব্যবহারজীবী, তাঁহাদের খ্যাতি বাড়িল। বিশেষতঃ, চিত্তরঞ্জন শ্রীঅরবিন্দের মুক্তি-কামনায় তাঁহার প্রতিভা নিয়োগ করায় তাঁহার খ্যাতি দেশব্যাপী হইল।

১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে আলিপুর আদালত-প্রাঙ্গণে আশুতোষ বিশ্বাস একজন বিপ্লবী কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। এ সংবাদ বাহির হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই দেশময় উৎসাহের আগুন জ্বলিয়া উঠে। যে তরুণ বিপ্লবী এই দুঃসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহার একটী হস্ত অকেজো ছিল। সেই হস্তে রিভলভার বাঁধিয়া অন্য হস্তের দ্বারা আশুতোষকে সে গুলী বিদ্ধ করে। পলায়নের দুর্ভাবনা এই বিপ্লবী করে নাই। আলিপুর বোমার আসামীদের দণ্ড দেওয়ার প্রতিবাদে এই মরণপণ কর্ম্মে সে অগ্রসর হইয়াছিল। আশুতোষ অনেক সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতাকামীদের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রচেষ্টার কথা সংবাদপত্রে ফলাও করিয়া প্রচারিত হইত। তিনি বিপ্লবীর হস্তে প্রাণ দিয়া মুক্তি পাইলেন। বিপ্লবী তরুণ হাসিমুখেই ফাঁসীর রজ্জু গলায় পরিতে কুণ্ঠা করিল না। বাংলার আকাশ-বাতাস আরও আগুন হইয়া উঠিল। ভারতের রাষ্ট্রসেবকেরা বাঙ্গালীর শৌর্য্য-বীর্য্যে স্তম্ভিত হইল। স্বাধীনতা-কামনায় ভেতো বাঙ্গালী কি অসীম সাহস

প্রদর্শন করিতে পারে, তাহা দেখিয়া দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিল।

বাংলার তরুণেরা আশায় ও উৎসাহে চতুর্দ্দিকে ডাকাতি করিয়া অর্থ-সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইল। ত্রিপুরা জেলায় অস্ত্রশস্ত্র-সংগ্রহের জন্য তাহারা একটী পুলিস-ফাঁড়ি লুণ্ঠন করিল। বেলঘরিয়ায় নারিকেলমালার বোমা বিদীর্ণ করিয়া বিপ্লবীরা উত্তেজনা বর্দ্ধিত করিল। বিচ্ক্রফ্ট্ সাহেব আশুতোষের স্থানে কোন নূতন উকিল নিয়োজিত করা সাধ্যাতীত মনে করিলেন। বাংলার সন্ত্রাসবাদিগণ শাসকজাতির চিত্তে যে আতঙ্ক সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সে যুগের ইতিহাসে তাহা রক্তাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

আলিপুর বোমার মামলায় নিম্নলিখিত ৩৮ জন বিপ্লবীর বিচার চলিতেছিল—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ইন্দুভূষণ রায়, উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ঘোষ, নলিনীকান্ত গুপ্ত, পরেশচন্দ্র মৌলিক, কুঞ্জলাল সাহা, বিজয়কুমার নাগ, নরেন্দ্রনাথ বক্সী, পূর্ণচন্দ্র সেন, হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ, বিভূতিভূষণ সরকার, নিরাপদ রায়, হেমচন্দ্র দাস, অরবিন্দ ঘোষ, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য, শৈলেন্দ্রনাথ বসু, দীনদয়াল বসু, সুধীরকুমার সরকার, কৃষ্ণজীবন সান্যাল, হৃষীকেশ কাঞ্জীলাল, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, ধরণীনাথ গুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অশোকচন্দ্র নন্দী, সুশীলকুমার সেন, দেবব্রত বসু, শচীন্দ্রকুমার ঘোষ, নিখিলেশ্বর রায়, চারুচন্দ্র রায়, ইন্দ্রনাথ নন্দী, হরিদাস দত্ত, বিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বালকৃষ্ণ হরি কানে, প্রভাসচন্দ্র দে।

নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে হত্যা করার ফলে কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথের ফাঁসী হওয়ায়, উপরোক্ত ৩৮ জনের বিচার দায়রা জজ বিচ্ক্রফ্ট্ সাহেব করিতেছিলেন। আমরা উল্লাসকর দত্তের আদালতে বসিয়াই সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা শুনিতে পাইতাম সংবাদপত্রের মারফতে।

অশোকচন্দ্র নন্দীর অসুস্থতার কথা মনোযোগ দিয়া পাঠ করিতাম আর ভাবিতাম দেশনায়ক অরবিন্দের কারাবরণে অশেষ ক্লেশের কথা। ভাবিতাম—চৈত্র-বৈশাখের দারুণ নিদাঘে দেশের এই সকল মুক্তিকামী সন্তানের দল কত দুঃখে কাল হরণ করিতেছেন। কানাইলালকে স্বচক্ষে দেখিয়া এই সকল উৎসাহী যুবকদের উন্নত চরিত্রের যদিও পরিচয় পাইয়াছিলাম, তবুও তাঁহাদের ক্লেশের কথা মর্ম্ম দিয়াই অনুভব করিতাম।

চারুচন্দ্র ফরাসী প্রজা। অন্যায়পূর্ব্বক তাঁহাকে চন্দননগর হইতে ইংরাজ পুলিসের হস্তে ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই অজুহাতে চারু বাবুর পরম বন্ধুস্থানীয় ফরাসী উকিল বনমালী পাল প্যারিসের পার্লামেণ্টে প্রশ্ন তুলিলেন। ইহা লইয়া আন্দোলন সুরু হইলে, বনমালী বাবুর নিকট গিয়া সকল সংবাদ গ্রহণ করিতাম ও চারু বাবুর মহীয়সী পত্নীর নিকট গিয়া সকল সংবাদ জানাইয়া আসিতাম। তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতাম যে, চারু বাবুকে আমরা শীঘ্রই মুক্ত করিয়া আনিতে পারিব। পরে বিধাতার কৃপায় ঘটিলও তাই। ফরাসী পার্ল্যামেণ্টের সৌজন্যে চারুবাবু জামীনে মুক্তিলাভ করিলেন। তিনি চন্দননগরে ফিরিয়া আসিলেন ও আমাদের জানাইলেন যে, কোনরূপ উপদ্রব সৃষ্টি করার এখন প্রয়োজন নাই। অর্থ ও অস্ত্র এখন প্রচুর পাওয়া যাইবে। উপস্থিত আমরা যেন কোনরূপ বৈপ্লবিক কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত না হই। তিনি আমাদের নেতৃপুরুষ, বিপ্লবের যতটুকু আয়োজন আমরা করিতেছিলাম, চারুচন্দ্রের নির্দ্দেশে তাহা স্থগিত রাখা হইল।

তখন বাংলার চতুর্দ্দিকে ডাকাতির হিড়িক চলিয়াছে। হুগলী জেলার হরিপালের নিকট মস্তপুর গ্রামে ডাকাতি, নেত্রায় পুলিস-ফাঁড়ির উপর আক্রমণ ও ডায়মণ্ড হারবারে ডাকাতির কথা সংবাদপত্রে বাহির হয়। আলিপুর বোমার মামলায় একদল তরুণ আটক পড়িলেও, বাহিরের

প্রদর্শন করিতে পারে, তাহা দেখিয়া দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিল।

বাংলার তরুণেরা আশায় ও উৎসাহে চতুর্দ্দিকে ডাকাতি করিয়া অর্থ-সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইল। ত্রিপুরা জেলায় অস্ত্রশস্ত্র-সংগ্রহের জন্য তাহারা একটী পুলিস-ফাঁড়ি লুণ্ঠন করিল। বেলঘরিয়ায় নারিকেলমালার বোমা বিদীর্ণ করিয়া বিপ্লবীরা উত্তেজনা বর্দ্ধিত করিল। বিচ্ক্রফ্ট্ সাহেব আশুতোষের স্থানে কোন নূতন উকিল নিয়োজিত করা সাধ্যাতীত মনে করিলেন। বাংলার সন্ত্রাসবাদিগণ শাসকজাতির চিত্তে যে আতঙ্ক সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সে যুগের ইতিহাসে তাহা রক্তাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

আলিপুর বোমার মামলায় নিম্নলিখিত ৩৮ জন বিপ্লবীর বিচার চলিতেছিল—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ইন্দুভূষণ রায়, উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ঘোষ, নলিনীকান্ত গুপ্ত, পরেশচন্দ্র মৌলিক, কুঞ্জলাল সাহা, বিজয়কুমার নাগ, নরেন্দ্রনাথ বক্সী, পূর্ণচন্দ্র সেন, হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ, বিভূতিভূষণ সরকার, নিরাপদ রায়, হেমচন্দ্র দাস, অরবিন্দ ঘোষ, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য, শৈলেন্দ্রনাথ বসু, দীনদয়াল বসু, সুধীরকুমার সরকার, কৃষ্ণজীবন সান্যাল, হৃষীকেশ কাঞ্জীলাল, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, ধরণীনাথ গুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অশোকচন্দ্র নন্দী, সুশীলকুমার সেন, দেবব্রত বসু, শচীন্দ্রকুমার ঘোষ, নিখিলেশ্বর রায়, চারুচন্দ্র রায়, ইন্দ্রনাথ নন্দী, হরিদাস দত্ত, বিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বালকৃষ্ণ হরি কানে, প্রভাসচন্দ্র দে।

নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে হত্যা করার ফলে কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথের ফাঁসী হওয়ায়, উপরোক্ত ৩৮ জনের বিচার দায়রা জজ বিচ্ক্রফট্ সাহেব করিতেছিলেন। আমরা উল্লাসকর দত্তের আদালতে বসিয়াই সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা শুনিতে পাইতাম সংবাদপত্রের মারফতে।

অশোকচন্দ্র নন্দীর অসুস্থতার কথা মনোযোগ দিয়া পাঠ করিতাম আর ভাবিতাম দেশনায়ক অরবিন্দের কারাবরণে অশেষ ক্লেশের কথা। ভাবিতাম—চৈত্র-বৈশাখের দারুণ নিদাঘে দেশের এই সকল মুক্তিকামী সন্তানের দল কত দুঃখে কাল হরণ করিতেছেন। কানাইলালকে স্বচক্ষে দেখিয়া এই সকল উৎসাহী যুবকদের উন্নত চরিত্রের যদিও পরিচয় পাইয়াছিলাম, তবুও তাঁহাদের ক্লেশের কথা মর্ম্ম দিয়াই অনুভব করিতাম।

চারুচন্দ্র ফরাসী প্রজা। অন্যায়পূর্ব্বক তাঁহাকে চন্দননগর হইতে ইংরাজ পুলিসের হস্তে ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই অজুহাতে চারু বাবুর পরম বন্ধুস্থানীয় ফরাসী উকিল বনমালী পাল প্যারিসের পার্লামেণ্টে প্রশ্ন তুলিলেন। ইহা লইয়া আন্দোলন সুরু হইলে, বনমালী বাবুর নিকট গিয়া সকল সংবাদ গ্রহণ করিতাম ও চারু বাবুর মহীয়সী পত্নীর নিকট গিয়া সকল সংবাদ জানাইয়া আসিতাম। তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতাম যে, চারু বাবুকে আমরা শীঘ্রই মুক্ত করিয়া আনিতে পারিব। পরে বিধাতার কৃপায় ঘটিলও তাই। ফরাসী পার্ল্যামেণ্টের সৌজন্যে চারুবাবু জামীনে মুক্তিলাভ করিলেন। তিনি চন্দননগরে ফিরিয়া আসিলেন ও আমাদের জানাইলেন যে, কোনরূপ উপদ্রব সৃষ্টি করার এখন প্রয়োজন নাই। অর্থ ও অস্ত্র এখন প্রচুর পাওয়া যাইবে। উপস্থিত আমরা যেন কোনরূপ বৈপ্লবিক কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত না হই। তিনি আমাদের নেতৃপুরুষ, বিপ্লবের যতটুকু আয়োজন আমরা করিতেছিলাম, চারুচন্দ্রের নির্দ্দেশে তাহা স্থগিত রাখা হইল।

তখন বাংলার চতুর্দ্দিকে ডাকাতির হিড়িক চলিয়াছে। হুগলী জেলার হরিপালের নিকট মস্তপুর গ্রামে ডাকাতি, নেত্রায় পুলিস-ফাঁড়ির উপর আক্রমণ ও ডায়মণ্ড হারবারে ডাকাতির কথা সংবাদপত্রে বাহির হয়। আলিপুর বোমার মামলায় একদল তরুণ আটক পড়িলেও, বাহিরের

প্রচেষ্টা দেখিয়া দেশবাসী আরও স্বাধীনতাকামী তরুণদের অস্তিত্বে আস্থাবান্ রহিল। চন্দননগর বিপ্লব-সমিতি চারুবাবুর কথা অনুসরণ করিয়া কিছু দিন নীরব রহিল।

চারুচন্দ্রের বিচার স্বনামখ্যাত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আদালতে উত্থাপিত হইয়াছিল। চন্দননগর হইতে ধৃত করিয়া আনার আদেশ আইনসঙ্গত হইয়াছে কিনা, এই বিচার তিনি যোগ্যতার সহিত করিয়া চারুচন্দ্রকে মুক্তি দিলেন। কলিকাতার উচ্চ আদালতের বিচারে চারু-চন্দ্রের মুক্তি চন্দননগরের বিপ্লবীদের মনে আশার সঞ্চার করিল। ইংরাজ পুলিস চারুচন্দ্রকে চন্দননগর হইতে যেমন ধৃত করিয়াছিল, তেমনই তাহারা তাঁহাকে চন্দননগরে আবার পৌঁছাইয়া দিয়া বিদায় লইতে বাধ্য হইল। তখন চারুচন্দ্র চন্দননগরেই বন্দী রইলেন, কিন্তু তাঁহার নিজ গৃহে আমাদের যাতাযাতের বাধা ছিল না। আমরা তাঁহার নিকট বসিয়া দিনের পর দিন আলিপুর বোমার মামলায় ধৃত ব্যক্তিদের কথা আলোচনা করিয়াছি এবং মোকদ্দমার ফল বাহির হওয়া পর্য্যন্ত উদ্‌গ্রীবভাবে মামলার ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়াছি।

ফরিদপুরে "সুহৃৎ-সমিতি" বিপ্লবপন্থী ছিল। প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় নামক কোন ব্যাক্তি এই সমিতির অনিষ্ট সাধন করিলে, তাহাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র হয়। কিন্তু এই ব্যক্তির পরিবর্ত্তে গণেশ নামক অন্য এক ব্যক্তি নিহত হয়। "সুহৃৎ-সমিতির" মত এইরূপ ভুলের পুনরাবৃত্তি না হয়, তজ্জন্য সকল বিপ্লববাসীদের সতর্ক করিয়া এক গোপন পত্রও প্রকাশিত হয়।

ইহার পর আলিপুর বোমার মামলার রায় প্রকাশিত হওয়ায় দেশে ভীষণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ সেন এবং যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েক জন ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বেই বেকসুর মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। ৩৮ জন ব্যক্তির উপর মকদ্দমা

চলিতেছিল বিচক্রফ্‌ট সাহেবের আদালতে। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা দণ্ডিত হইলেন, তাঁহাদের নাম ও দণ্ডাদেশ নিম্নে প্রদত্ত হইল: বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও উল্লাসকর দত্ত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র দাস, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, ইন্দুভূষণ রায়, বিভূতিভূষণ সরকার, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সুধীরকুমার সরকার, ইন্দ্রনাথ নন্দী, শৈলেন্দ্রনাথ বসু এবং বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের আদেশ প্রাপ্ত হন। দশ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন পরেশচন্দ্র মৌলিক, শিশিরকুমার ঘোষ ও নিরাপদ রায়।

সুশীলকুমার সেনের ৭ বৎসর দ্বীপান্তর হয়। কৃষ্ণজীবন সান্যাল ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করেন। শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ অবশিষ্ট সকলে মুক্তিলাভ করেন।

কারামুক্ত হইয়াই শ্রীঅরবিন্দ "ধর্ম্ম" নামক একখানি বাংলা সাপ্তাহিক ও "কর্ম্মযোগিন্" নামক আর একখানি ইংরাজী সাপ্তাহিক বাহির করেন। দণ্ডিত ব্যক্তিগণ উচ্চ আদালতে আপীল করিলেন। এদিকে দেশে ডাকাতির ধুম চলিয়াছে। খুলনা, টালা প্রভৃতি স্থানে লুণ্ঠন-কার্য্যে বিপ্লবিগণ এই সময়ে মরিয়া হইয়া উঠে। ১১ই অক্টোবর রাজেন্দ্রপুরে ট্রেণ-ডাকাতি করিয়া বিপ্লবিগণ ২৩ হাজার টাকা লুণ্ঠন করিয়া লয়। কিন্তু পুলিসের তদ্বিরে ইহার ১১ হাজার ৮ শত ৬৮ টাকা পুনঃপ্রাপ্তির সংবাদও বাহির হয়। ফরিদপুর, হলুদবাড়ী, দৌলতপুর, নদীয়া প্রভৃতি স্থানে ঘন-ঘন ডাকাতি হইতে থাকে। ১০ই নভেম্বর ঢাকায় বড় রকমে ডাকাতি হয়। ইহাই মাণিকগঞ্জ রাজনগরের ডাকাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাতে ২৭ হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়। ১১ই নভেম্বর যে ডাকাতি হয়, তাহা ত্রিপুরা মোহনপুর ডাকাতি বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই ডাকাতিতে ১৬ হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয় এবং বিপ্লবীরা ঘরবাড়ীতে আগুন ধরাইয়া দেয়। ২৩শে নভেম্বর আলিপুর

মামলার আপীলের রায় বাহির হয়। তাহাতে দেখা যায়—বারীন্দ্র-কুমারের প্রাণদণ্ড রহিত হইয়াছে। উল্লাসকরও প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ পাইয়াছেন। হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, ইন্দুভূষণ রায় ও বিভূতিভূষণ সরকারের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের পরিবর্ত্তে আপীলে ১০ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে। অবিনাশচন্দ্র ও সুধীরকুমারের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের পরিবর্ত্তে ৭ বৎসর এবং পরেশচন্দ্র মৌলিকের ১০ বৎসর দ্বীপান্তরের স্থলে ৭ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ডই বহাল হইয়াছে। শিশিরকুমার ঘোষ ও নিরাপদ রায় দায়রার বিচারে ১০ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। আপীলে ৪ বৎসর সশ্রম কারাবাসের দণ্ড বাহাল হইয়াছে। ইন্দ্রনাথ নন্দী, শৈলেন্দ্রনাথ বসু, ধীরেন্দ্রনাথ সেন, সুশীল-কুমার সেন, এই ৫ জনের বিষয়ে দুইজন জজের মতভেদ ঘটায়, তৃতীয় জজের নিকট ইঁহাদের পুনর্ব্বিচারের ব্যবস্থা হয়। আপীলে কলিকাতার বড় আদালতের প্রধান বিচারপতি লরেন্স জেঙ্কিন্স এবং মিঃ কর্ণিডফ আসামীদের বিচার করেন। উপরোক্ত ৫ জনের বিচার-ফলে উভয় জজের মতানৈক্যবশতঃ উহা মিঃ হ্যারিংটনের বিচারাধীন হয়। ২৩শে নভেম্বর আলিপুর মামলার রায় বাহির হওয়া মাত্র ২৪শে নভেম্বর আগড়-তলায় এণ্ড্রু ফ্রেজারকে হত্যা-চেষ্টার অপরাধে এক ব্যক্তিকে সন্দেহক্রমে ধৃত করা হয়। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে চতুর্দ্দিকে বাংলার বিপ্লবীরা ডাকাতি করিয়া অর্থসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এই বৎসরেই পুলিনচন্দ্র দাস, অশ্বিনীকুমার দত্ত, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রভৃতি নেতৃপুরুষগণকে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের আইনানুসারে বন্দী করা হয়। আলিপুরের বোমার মামলায় দেশব্যাপী অশান্তি দূর না হইয়া স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বিপ্লবীদের প্রাণে সমধিক অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে। সমগ্র বাংলাদেশ জুড়িয়া বিপ্লবী তরুণদের কার্য্যালাপে ইংরাজের আসন টলিবার উপক্রম হয়। ১১ই ডিসেম্বর ইংরাজ একটী আইন করিয়া সন্দেহভাজন

ব্যক্তিমাত্রকেই বিচারে দণ্ড দিবার সুযোগ করিয়া লন। যে ট্রাইবুন্যালে বিচার হইবে, আইনে তাহাতে ৩ জন মাত্র জজ থাকিবেন স্থির হয়। জুরী বা এসেসর এই বিচারক্ষেত্রে থাকিবার প্রয়োজন হইবে না। তথাপি বাংলার বিপ্লববাদ বিস্তৃত হইয়াই চলিল। বাঙ্গালী স্বাধীনতার নিশান উড়াইয়া প্রাণের ভয় রাখিল না। সে কি উত্তেজনায়, আশায়, আনন্দে বাংলার তরুণ সেদিন মৃত্যুবরণও শ্রেয়ঃ করিয়াছে, আমরা সেই কথাই পরে বিবৃত করিব।

গীতার যোগী শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীঅরবিন্দের "ধর্ম্ম" ও "কর্ম্মযোগিন" পত্রিকার নিয়মিত পাঠক হইলাম। ধর্ম্মের ভিত্তির উপর রাষ্ট্রস্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা দিতেই শ্রীঅরবিন্দ উদ্বুদ্ধ হইলেন। আমাদের বিপ্লবী বন্ধু শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বাংলায় "কর্ম্মযোগিন্" নামে একখানি সাপ্তাহিক বাহির করিলেন। আমরা এক প্রকার সাংস্কৃতিক সংগঠন-কর্ম্মে উদ্যোগী হইলাম।

শ্রীঅরবিন্দের "ধর্ম্ম" ও "কর্ম্মযোগিন" পত্রিকা ১৯০৯ সালের আষাঢ় মাসের শেষে বাহির হয়। ইহার কিছু পরেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন চুঁচুড়ার গৌরাঙ্গ নাটমন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। এই সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন উত্তরপাড়ার পরলোকগত কুমার রাজেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়। আর সম্পাদক হইয়াছিলেন হুগলী আদালতের উকিল ৺বিপিনবিহারী মিত্র। এই সভার পৌরোহিত্য করেন বহরমপুরের বৃদ্ধ নেতা ৺বৈকুণ্ঠনাথ সেন। অরবিন্দের মুক্তির পর এই সম্মেলন কি ভাবে সম্পন্ন হইবে, তাহা লইয়া নরমপন্থী ও চরমপন্থিগণের মধ্যে অনেক বাদানুবাদ হয়। শ্রীঅরবিন্দের ছত্রতলে সেদিন দেশের চরমপন্থী দল একত্র হইয়াছিল। অন্যপক্ষে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মধ্যপন্থী নেতৃগণ। আমরা

চন্দননগরের বিপ্লবপন্থী দল এই সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য বিশেষভাবে আহূত হই এবং চারুচন্দ্র রায়ের অনুমত্যনুসারে আমরা কয়েকজন তরুণ বিপ্লবী দর্শকের আসনে গিয়া উপবেশন করি। নরমপন্থীদের কোনরূপ হঠকারিতা দেখিলেই চরমপন্থীদের পক্ষ সমর্থন করার জন্য আমরা প্রস্তুত হইয়াই গিয়াছিলাম। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ এই সভায় স্থির-মস্তিষ্কে মধ্য-পন্থীদের কর্ম্ম-পরিচালনায় যোগ দেওয়ায়, সভার কার্য্যে কোনরূপ গণ্ডগোল হয় নাই। দেশের তরুণেরা বাংলার চরমপন্থীদের নির্দ্দেশিত পথে চলার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিল। শ্রীঅরবিন্দকেই আমরা সর্ব্বসম্মত জাতীয়তাবাদী নেতা বলিয়া স্বীকার করিতাম। তিনি এক দল তরুণের সহিত সভাক্ষেত্রে যখন উপস্থিত হইলেন, সভাক্ষেত্র চঞ্চল হইয়া উঠিল। যেন সভা-মধ্যে উত্তেজনার অগ্নিস্রোতঃ বহিল। যে সকল তরুণ শ্রীঅরবিন্দকে লইয়া সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাদের কণ্ঠে জাতীয়তামূলক সঙ্গীতের ঝরণা ঝরিতেছিল। আমরা মুগ্ধচিত্তে ও সগৌরবে শ্রীঅরবিন্দের সভাগৃহে প্রবেশ ও সভামঞ্চে উপবেশন লক্ষ্য করিলাম ও আমাদের নীরব শ্রদ্ধায় তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলাম। সেদিন শ্রীঅরবিন্দকে দেশ দেখিয়াছিল—মুক্তির দেবতারূপে। বাংলার মুক্তিযজ্ঞের এই সর্ব্বপ্রধান পুরোহিতকে নবজাতি হৃদয় দিয়া সেইদিন বরণ করিয়া লইয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দ আত্মভোলা শিবের মত যখন দেশবাসীকে আহ্বানপূর্ব্বক জাতীয়তার বাণী শুনাইলেন, তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্রোতৃবর্গের কর্ণে কি মধু-বর্ষণ করিয়াছিল, তাহা সেই সভায় উপস্থিত জাতীয়তাবাদী প্রত্যেকেই অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই আমাদের ধারণা। তিনি দক্ষিণ হস্তটি উঠাইয়া যখন কথা বলিলেন, লক্ষ্যে পড়িল—তাঁহার কামিজের হাতায় বোতাম নাই, তাই হাতা ঝুলিতেছে। সভা নীথর, নিস্তব্ধ। বক্তার যাদুকরী কণ্ঠধ্বনি ব্যতীত আর কোন শব্দই ছিল না।

বাতাসও বুঝি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল শ্রীঅরবিন্দের সর্ব্বাকর্ষিণী বাণীর মহিমায়।

সভা শেষ হইল। ১৮টী প্রস্তাব শ্রীঅরবিন্দ শান্তভাবেই গ্রহণ করিলেন। মধ্যপন্থীরা আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, শ্রীঅরবিন্দের উপস্থিতিতে সভাগৃহে হয়তো দক্ষযজ্ঞের পুনর্ভিনয় হইবে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের ধীর আচরণে তাহার কিছুই হইল না দেখিয়া তাঁহারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। প্রস্তাবগুলি বাহুল্য-বোধে এখানে আর উদ্ধৃত করিলাম না।

কারা-মুক্তির পর ভারতের রাজনীতিক ক্ষেত্রে চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের মধ্যে অদ্বিতীয় স্থান শ্রীঅরবিন্দ অধিকার করিয়াছিলেন। বাংলা এবং ভারতের সর্ব্বত্র মধ্যপন্থী নেতাদের কথা আর কেহ শুনিতে চাহিত না। সুরেন্দ্রনাথ কোন স্বদেশী সভায় বক্তৃতা করিতে উঠিলে, শ্রোতৃগণ চীৎকার করিয়া সভার কার্য্য পণ্ড করিয়া দিত। এই সময়ে ৺ব্রহ্ম-বান্ধবের 'সন্ধ্যা' কাগজে নরমপন্থীদের বিরুদ্ধে অতিশয় কটু কথা লেখা হইত। সুরেন্দ্রনাথের মস্তক লইয়া গেণ্ডুয়া খেলার ব্যঙ্গ-ছবিও 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে দেখিয়াছি। শ্রীঅরবিন্দ যে সভায় উপস্থিত হইতেন, তাঁহার বাণী শুনিবার জন্য জনগণ উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া আসিত। জাতীয়তার প্রেরণায় সকলেরই প্রাণ উদ্বুদ্ধ হইত। তাঁহার কথায় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাই সকলের হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিত। তিনি পরলোকগত ব্যারিষ্টার রজত রায়কে সহকর্ম্মীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অগ্নিবর্ষী বক্তা অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন। তাঁহার চরমপন্থী দলের মধ্যে কৃতান্তকুমার বসুর নামও আমাদের মনে পড়িতেছে। শ্রীঅরবিন্দ যে "বন্দেমাতরম্" কাগজের নায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও হেমেন্দ্র

প্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি মনীষিগণ তাহার সম্পাদকীয় স্তম্ভে সংযুক্ত ছিলেন বলিয়া আমরা শুনিয়াছি।

স্বদেশী যুগের কথা স্মরণ করিলে, আমাদের "ইণ্ডিয়ান্ ষ্টোরের" কথাও মনে পড়ে। স্বদেশজাত দ্রব্য খরিদ করার জন্য এই প্রতিষ্ঠানে যাইতে হইত। ইহার প্রধান অবৈতনিক অধ্যক্ষ ছিলেন পরলোকগত ব্যারিষ্টার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। অব্যবসায়ীর হস্তে স্বদেশী যুগেই "ইণ্ডিয়ান্ ষ্টোর" উঠিয়া যায়। "ছাত্রভাণ্ডার" প্রভৃতি স্বদেশী প্রতিষ্ঠানও এই সময়ে গড়িয়া উঠে।

১৩১৬ সালের ৩০শে আশ্বিন রাখী-বন্ধনোৎসব আবার দেশব্যাপী জাগরণের কারণ হয়। আমরা শত-শত তরুণের হাতে স্নানান্তে রাখী বাঁধিয়া দিয়াছি। সে যুগের অগ্নিবার্ত্তা বহিয়া গ্রামে-গ্রামে ঘুরিয়াছি। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন বিপ্লবের প্রধান পুরোহিত। মাণিকতলার পর যে মন ভাঙ্গিয়াছিল, শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাবে তাহা বিপুল উৎসাহে দেশময় স্বাধীনতার প্রচারে পুনরায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে স্থানে-স্থানে বিপ্লবিগণ কর্ত্তৃক ডাকাতির মোকদ্দমা চলিত। স্থানে-স্থানে ডাকাতির অভিযোগে বহু বিপ্লবী যুবক ধৃত হইতেন। তখনকার সংবাদপত্র-পাঠের ভিতর বাংলার বিপ্লবই ছিল প্রধান উপজীব্য বিষয়। নেত্রা, রাজেন্দ্রপুর, বিঘাটি, রবা প্রভৃতি স্থানের ডাকাতির ইতিহাস আদালতের বিচারকালে পুনর্জ্জীবিত হইয়া বিপ্লবীর প্রাণে উৎসাহ সঞ্চার করিত।

এই সময়ে বাংলার বিপ্লবিগণের অন্তরে আশার বিদ্যুৎ জ্বালিতেন কৃষ্ণবর্ম্মা। তিনি বিলাত হইতে "বন্দেমাতরম্" পত্রিকা প্রকাশ করিয়া ভারতবর্ষে ছড়াইয়া দিতেন। তাঁহার বিখ্যাত 'তলোয়ার' পত্রিকাখানিও আমরা অতিশয় আগ্রহের সহিত পাঠ করিতাম। বিলাতের পার্ল্যামেণ্টে ইংরাজ সিভিলিয়ানকে গুলীর আঘাতে নিহত করায় মদনমোহন ধিংড়ার

নাম ঘরে-ঘরে প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার ফাঁসীর দিন ভারতের জাতীয়তাবাদী জনগণ সভা করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দক্ষিণ ভারতে এশ্ ও জ্যাক্‌সন সাহেবদ্বয়ের নিধন-বার্ত্তায় বাংলার বিপ্লব ভারতের সর্ব্বত্র সুপ্রচারিত হইতে দেখিয়া আনন্দে আমাদের হৃদয় লম্ফ দিয়া উঠিত। বিপ্লবী বীর দামোদর সাভারকরের বিচিত্র জীবন-কাহিনী লইয়া আমাদের মধ্যে আলোচনা চলিত। মহারাষ্ট্রের রাষ্ট্রনেতা তিলক মহারাজের প্রতি বাঙ্গালীজাতি অতিশয় সম্মান প্রদর্শন করিত। পঞ্জাবের লাজপতের কথাও বাংলার অবিদিত ছিল না। সংবাদপত্রে গর্ব্বের সহিত লাল-বাল-পাল ত্রয়ীর নামে জাতীয় নেতৃত্বের পরিচয়ও সেদিন প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছিল।

১৯১০ খৃষ্টাব্দের গোড়াতেই মাণিকতলার বোমার মামলায় যে পাঁচ জন ধৃত ব্যক্তির প্রতি বিচারপতি জেঙ্কিন্স ও বিচারপতি কার্ণ্‌ডফের বিচারফল ঐক্যযুক্ত হয় নাই, বিচারপতি হ্যারিংটনের আদালতে তাঁহাদের পুনর্বিচার আরব্ধ হইল। বিচারপতি জেঙ্কিন্স ও কার্ণডফের এজলাসে আসামীদের বিরুদ্ধে ব্যারিষ্টার মিষ্টার নর্টনের নাম যেমন সর্ব্বজনবিদিত হইয়াছিল, এই বিচারকালে ব্যারিষ্টার মিঃ ষ্টোক্‌সের নামও সেইরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিল।

বিচারপতি জেঙ্কিন্স ও কার্ণডফের দণ্ডদান সম্বন্ধে মতানৈক্য হয় যে পাঁচজন আসামীর সম্বন্ধে, তাহাদের নাম—ইন্দ্রনাথ নন্দী, শৈলেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণজীবন, সুশীলকুমার ও বীরেন্দ্রনাথ। ইন্দ্রনাথ নন্দীর পক্ষে স্বনামখ্যাত ব্যোমকেশ, শৈলেন্দ্র ও কৃষ্ণজীবনের পক্ষে বিজয়কৃষ্ণ বসু, সুশীল ও বীরেন্দ্রের পক্ষে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ওকালতি করিয়াছিলেন।

মাণিকতলার বোমার মামলায় স্বাধীনতাকামীদের ধৃত করার কুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন ইন্সপেক্টার রামসদয় মুখোপাধ্যায়। তাঁর কৃতিত্বের কথা কর্ত্তৃপক্ষ যেমন শতমুখে প্রচার করিতেন, তেমন বাংলার বিপ্লবিগণ

তাঁহাকে হত্যা করার প্রচেষ্টা সর্ব্বদাই করিতেন। এই রামসদয়বাবু অতি কৌশলে বোমার আসামীদের স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন। এইগুলিই ছিল মাণিকতলা বাগানের আসামীদের বিরুদ্ধে উৎকৃষ্ট প্রমাণ। নরেন্দ্রনাথ গুলীতে নিহত হওয়ার পর মাণিকতলা মোকদ্দমা শেষ হইলে, রামসদয় বাবু এক বৎসরের জন্য অবসর গ্রহণ করেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের গোড়াতেই তিনি আরও এক বৎসর অবকাশ প্রার্থনা করেন। তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে থাকিলে তাঁহার জীবননাশের ব্যবস্থা বিপ্লবিগণ নিশ্চয় করিতেন। রামসদয়বাবু চতুরতার সহিত কর্ম্মক্ষেত্র হইতে এইরূপে অপসারিত হন।

বাংলার বিপ্লবিগণ নীরব রহিল না। চতুর্দ্দিকেই অর্থসঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে লুঠতরাজ হইতে লাগিল। চন্দননগরের বিপ্লবী তরুণেরাও এই কর্ম্মে অত্যন্ত ব্যস্ত হওয়ায়, চারুচন্দ্র রায়ের নির্দ্দেশে বিপুলভাবে সরস্বতী-পূজার আয়োজন করা হইল। তরুণদের চিত্তকে তিনি এইভাবে গঠনের পথে ফিরাইতে প্রয়াস করিয়াছিলেন। এই সকল তরুণদের মধ্যে আশুতোষ নিয়োগীর কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করি। চারুবাবুর প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করার জন্য এই বিপ্লবী তরুণ প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, আশুতোষ নিয়োগী, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ও আমায় লইয়া চারুবাবু এই সংস্কৃতিমূলক সরস্বতীপূজার উদ্দেশ্যে এক কার্য্যকরী সভা গঠন করেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে বাগবাজারের করের বাগান বলিয়া যে স্থানটী সহরবাসীর পরিচিত ছিল, সেইখানেই এই অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। এই উৎসবের অঙ্গ ছিল—বাংলার অতীত বাণীপূজকদের প্রতি জাতির শ্রদ্ধা-নিবেদন। নদীয়া হইতে মৃৎশিল্পী আনাইয়া আমরা মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, ভূদেব প্রভৃতির মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া, তাঁহাদের বিষয় দেশবাসীকে

বুঝাইবার জন্য তাঁহাদের রচনার কিয়দংশ লিপিপটে তুলিয়া এই সকল মূর্ত্তির সঙ্গে সংস্থাপিত করি। দেবী সরস্বতীর দুই পার্শ্বে বাল্মীকির আশ্রমে বীণা হস্তে লবকুশের মূর্ত্তি আর অন্য দিকে ব্যাসের মহাভারত-রচনার লেখক গণেশের মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া দর্শক-বৃন্দের প্রভূত আনন্দ-সঞ্চারের ব্যবস্থা করা হয়। এই সরস্বতী-পূজার ধুমে আমাদের চিত্ত সাংস্কৃতিক সংগঠনের রসে অভিষিক্ত হইয়াছিল। আমরা চারুবাবুর নির্দ্দেশিত পথই শ্রেয়ঃ-বোধে গ্রহণ করিলাম। এই সময়ে চতুর্দ্দিকেই অশান্তির ঝড় বহিতেছিল। কলিকাতার চতুর্দ্দিকেই ডাকাতি হওয়ার সংবাদ আমরা নিশ্চয়ই পাইতাম। শিয়ালদহ হইতে ট্রেণের উপরে নারিকেলমালার বোম-নিক্ষেপের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। একদিন সংবাদপত্রে বাহির হইল—কাকুরগাছির কোন বাগানবাড়ী হইতে গুলী ছুঁড়িয়া ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজের সম্পাদককে চলন্ত গাড়ীতে হত্যা করার প্রচেষ্টা হইয়াছিল। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও পুলিস অপরাধীর সন্ধান করিতে পারে নাই। সুরেন্দ্রনাথ ব্যারাকপুরে এইরূপ অপরাধ-নিবারণের জন্য এক পর্য্যবেক্ষণসমিতি গঠন করেন। ইংরাজের মনস্তুষ্টি করা ব্যতীত এই কার্য্যে তিনি বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ইহার পরই শুনা গেল—আলিপুর বোমার মামলার শুনানীর সমক্ষে গোয়েন্দা-পুলিসের ডেপুটী ইন্‌সপেক্টর-জেনারেল সামসুল আলমের নিষ্ঠুর মৃত্যু-কাহিনী। কলিকাতার উচ্চ আদালত-গৃহেই বিপ্লবকারীর হস্তে তাঁহার নিধন-বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। কলিকাতার বিপ্লব-কার্য্য মাণিকতলার আবিস্কারেও পুলিস ব্যর্থ করিতে পারে নাই, এই প্রমাণ বাঙালীজাতিকে প্রোৎসাহিত করিল। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় বাংলা যেন উন্মাদ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। কোন প্রদেশে তেমন ভাবে সেদিনও বিপ্লবের প্রকাশ হয় নাই। উপরোক্ত ঘটনাকে উপলক্ষ

করিয়াই শ্রীঅরবিন্দের উপর পুলিসের প্রখর দৃষ্টি আবার পড়িল। এই সময়ে পরলোকগতা ভগ্নী নিবেদিতা কলিকাতার বাগবাজারে অবস্থান করিতেন। শ্রীঅরবিন্দের প্রতি শ্রদ্ধা বাঙ্গালীমাত্রেরই ছিল। শ্রীঅরবিন্দকে স্বাধীনতার ঋষি বলিয়া আখ্যা দিতে কেহ কুণ্ঠা করিত না। রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দকে লক্ষ্য করিয়া "অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার" এই চির-প্রসিদ্ধ কবিতাটী রচনা করিয়াছিলেন। সামসুল আলমের হত্যাকাণ্ডে শ্রীঅরবিন্দকে সংজড়িত করার সংবাদ ভগ্নী নিবেদিতার কর্ণে পৌঁছিয়াছিল। এই সময়ে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ভগ্নী নিবেদিতার সহিত আলাপ করিবার জন্য প্রায় প্রতি অপরাহ্নেই বেড়াইতে আসিতেন। শ্রীঅরবিন্দকে পুনরায় বন্দী হইতে না হয়, তাহার জন্য আচার্য্য জগদীশ ও সিষ্টার নিবেদিতা উভয়ে পরামর্শ করিয়া স্থির করেন যে, শ্রীঅরবিন্দকে আত্মগোপন করারই অনুরোধ করা হইবে। শ্রীঅরবিন্দের নিকট সেই প্রস্তাব ভগ্নী নিবেদিতা স্বয়ং উপস্থাপিত করিলেন। শ্রীঅরবিন্দ ভগ্নী নিবেদিতার প্রস্তাব শুনিলেন; কিন্তু তখনই গ্রহণ করিতে পারিলেন না। ইহার অত্যল্প কাল পরেই তাঁর নিজের অনুভূতির ক্ষেত্রে প্রত্যাদেশের বাণী ফুটিয়া উঠিল—"চন্দননগরে যাও"। ইহার পূর্ব্বে শ্রীঅরবিন্দ যখন আলিপুর মামলায় বন্দী হইয়া গ্রে ষ্ট্রীটস্থ বাসভবন হইতে লালবাজার নীত হন, তখন যে গাড়ীতে চড়িয়া আসিতেছিলেন, তাঁহার চক্ষের পুরোভাগে তাহাতে উপবিষ্ট ঠাকুর রামকৃষ্ণকে তিনি সন্দর্শন করেন, ইহা তাঁর মুখেই আমরা পরে শুনিয়াছি। তিনি বাংলার বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের ন্যায় ঈশ্বর-পুরুষের প্রতি কিরূপ অনুরাগী ছিলেন, তাহা তাঁহার "কর্ম্মযোগিন্" যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন। শ্রীঅরবিন্দ আলিপুর জেলে বসিয়াও বহু অলৌকিক উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এইখানে তাঁর

বাসুদেব-দর্শনের কথা পরে তাঁহার বিখ্যাত বক্তৃতায় তিনি স্বয়ং অনু-প্রেরিত-বাণীমুখে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভগবানের নির্দ্দেশ পাইয়া, তিনি অতঃপর চন্দননগরে যাত্রা স্থির করিয়া ফেলিলেন। তাঁর আত্মীয় ও ভক্ত সুকুমার মিত্রকে তিনি সকল কথাই বলিয়াছিলেন। ভক্ত রামচন্দ্র মজুমদারও তাঁহার প্রস্থানের কথা জানিলেন। আহেরীটোলার ঘাটে গিয়া নৌকা ভাড়া করা হইল। "ধর্ম্ম" ও "কর্ম্মযোগিনের" তিনি ভার দিয়া গেলেন সুকুমার ও রামচন্দ্রের উপর। নির্দ্দিষ্ট যাত্রায় তাঁর সঙ্গী হইলেন নলিনী গুপ্ত, বিজয় নাগ আর সুরেশ চক্রবর্ত্তী।

ফাল্গুনের প্রভাতে তরী আসিয়া চন্দননগরে রাণীর ঘাটে পৌঁছিল। সুরেশচন্দ্র সংবাদ লইয়া গেল বিপ্লবনেতা চারুচন্দ্র রায়ের নিকট। কিন্তু সেদিন ঘটনার আকস্মিকতার জন্য চারুবাবু আপনাকে প্রস্তুত রাখিতে পারেন নাই। শ্রীঅরবিন্দকে আশ্রয় দিতে তিনি ইতঃস্তত করিলেন— বরং বলিলেন 'আত্মগোপন করার স্থান কলিকাতার ন্যায় জনবহুল স্থানেই যতটা সম্ভবপর, চন্দননগরে তাহা নহে।' সুরেশচন্দ্র নিরাশ হইয়া নৌকায় ফিরিলেন। শ্রীঅরবিন্দ গীতায় আত্মসমর্পণ-যোগের প্রথম অঙ্কে সেদিন নিঃসংশয়ে পা বাড়াইয়াছেন। শক্তিচালিত হইয়া তিনি আসিয়াছেন চন্দননগরে। ভাগবতশক্তিই তাঁকে নিরাপদ আশ্রয় দিবেন, এই পরম নির্ভরতা লইয়াই তিনি ভক্ত বিজয় নাগের কোলে মাথা রাখিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত চিত্তে সমাহিত রহিলেন।

বেলা বাড়িলে, চারুবাবুর বৈঠকখানায় প্রতিদিনের ন্যায় সেদিনও চায়ের আসর বসিয়াছিল। তরুণ ও প্রবীণ সঙ্গীরা যথারীতি তাহাতে যোগ দিলেন। শ্রীশচন্দ্র ঘোষও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীশচন্দ্রকে চারুবাবু সকল কথা জানাইলে, সে ঊর্দ্ধশ্বাসে আমার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি উপাসনার পরে সামান্য প্রাতরাশ সারিয়া ভ্রমণে বাহির হইতেছিলাম। শ্রীশচন্দ্রের মুখে সকল

কথা শুনিলাম। শ্রীঅরবিন্দকে হুগলী প্রাদেশিক সভায় দেখিয়া আমি তাঁহার প্রতি আকৃষ্টচিত্ত হইয়াছিলাম। চন্দননগরে আসিয়া তিনি বিমুখ হইয়া ফিরিবেন, এ চিন্তায় আমার মনে দুঃখের অবধি রহিল না। শ্রীশচন্দ্রকে বিদায় দিয়া আমি মনের প্রেরণায় গঙ্গাতীরে ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িলাম।

ফাগুনের হাওয়া বহিয়াছে। শীতের দিনে গঙ্গা কিছু ক্ষীণা হইয়াছেন। কোলে-কোলে বালুচর পড়িয়াছে। তাহার উপর দিয়া আজ উত্তর দিক্ ছাড়িয়া দক্ষিণমুখে চলিতে সুরু করিলাম। রাণীর ঘাটে আসিয়া দেখিলাম—একখানি ভাউলিয়া তখনও নোঙ্গর করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ভাউলিয়ার চালে দুইজন তরুণ গুন্-গুন্ করিয়া গান গাহিতেছেন। এই ভাউলিয়া যে কলিকাতা হইতেই আসিয়াছে, এ বিষয়ে আমার সংশয় রহিল না। তরুণদের আহ্বান দিয়া বলিলাম "আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন?" তাঁহারা আমায় তরণীর উপর ডাকিয়া লইলেন। আমি বিস্ময়বিহ্বল হইয়া দেখিলাম—ভারতের স্বাধীনতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঋষি শ্রীঅরবিন্দকে। তিনি বিজয় নাগের কোল হইতে ধীরে-ধীরে মাথা তুলিয়া আমায় ভিতরে প্রবেশ করিতে বলিলেন। তাঁহার নয়নে সেদিন স্বর্গের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতে দেখিয়াছি; কণ্ঠস্বরে ছিল অনাদি যুগের পরিচয়-মধু। চির পরিচিতের ন্যায় তিনি বলিলেন "এখান হইতে কত দূরে তোমার বাড়ী?"

শ্রীঅরবিন্দ বুঝিয়াছিলেন যে, আমারই আশ্রয় মহাকালীর অব্যর্থ নির্দ্দেশ। তাঁহাকে আশ্রয় দিবার যোগ্যতা আমার কিছুই ছিল না। কিন্তু এই দিব্য সংযোগ আমায় আনন্দে বিভোর করিল। তারপর শুধু বিপ্লব-কর্ম্মে নহে, অধ্যাত্মসাধনায় তাঁর দিব্য-সঙ্কেত-লাভে আমি ধন্য হইয়াছি। মাঝিদের নোঙ্গর উঠাইতে বলিলাম। নৌকা চলিল উজানে, পালে ভর করিয়া। দাঁড় পড়িল ঝপাস্-ঝপাস্! সে বড়

মধুর শব্দ! শ্রীঅরবিন্দ আমার জন্য যেন প্রতীক্ষা-রত ছিলেন। দুইজনের চক্ষুই মধু বর্ষণ করিল। তিনি আমায় চিনিলেন, আমিও তাঁহার পরিচয় পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। আঘাটায় নৌকা বাঁধিলাম, কারণ ঘাটে ছিল অনেক পরিচিত প্রতিবেশী।

অজ্ঞাতবাস—চন্দননগর হইতে পণ্ডিচারী

শ্রীঅরবিন্দকে বাড়ীতে আনিলাম। তাঁহার আত্মগোপন করার সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থাই করা হইয়াছিল। চন্দননগরে তাঁহার আগমন-সংবাদ আমি, আমার পত্নী, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, গোন্দলপাড়া-নিবাসী নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমার তদানীন্তন নিকট বন্ধু শ্রীননীলাল দে ব্যতীত আর কেহই জানে নাই। শ্রীঅরবিন্দের সহিত আসিয়াছিলেন নলিনী গুপ্ত, সুরেশ চক্রবর্ত্তী ও বিজয় নাগ। আর "ধর্ম্ম" পত্রিকার সহিত সম্বন্ধ-রক্ষার হেতু হইয়াছিলেন রামচন্দ্র মজুমদার। তিনিও শ্রীঅরবিন্দের কলিকাতা-ত্যাগকালে আহিরীটোলার ঘাট পর্য্যন্ত সঙ্গে-সঙ্গে ছিলেন। অতএব শ্রীঅরবিন্দের চন্দননগরে আগমন-কথা এই কয় জন অবগত ছিলেন। অপরে এই কথা জানিতে না পারায়, পুলিস তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে নাই এবং দেশনেতৃগণও শ্রীঅরবিন্দের অকস্মাৎ আত্মগোপনের সংবাদে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। কোন এক সংবাদপত্রে তাঁহার অন্তর্দ্ধানের কথা উল্লেখ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল যে, তিনি মহাত্মা কুথুমীর নিকট যোগশিক্ষার জন্য প্রস্থান করিয়াছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দের প্রসঙ্গ লইয়া এই ক্ষেত্রে অধিক আলোচনা করিব না। চন্দননগরে তাঁর থাকাকালীন বহু বিবরণ স্বতন্ত্র গ্রন্থে (মৎপ্রণীত জীবন-সঙ্গিনী গ্রন্থে) ও পত্রিকায় আমি প্রকাশ করিয়াছি।

ভারতের এই অদ্বিতীয় জাতীয় নেতা ও বাংলার বিপ্লবগুরু চন্দননগরে শুভ পদার্পণ করিলেন গীতার আত্মসমর্পণ-যোগের সিদ্ধ সাধক ও কালী-চালিত মহাযন্ত্ররূপে। এ জাতির রাষ্ট্রীয় ও আধ্যাত্মিক উভয় ইতিহাসেরই এক যুগসন্ধি-পর্ব্বে তার এই আগমনের ঘটনা তাই চির স্মরণীয় হইয়া রহিবে।

সে এক জ্যোৎস্না-রাত্রে শ্রীঅরবিন্দকে আবার বড়াই-চণ্ডীতলার ঘাটে বিদায় দিয়া ঘরে ফিরিয়াছি। সে গভীর রাত্রে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কয়েকটি তরুণের সহিত তরণী-যোগে তাঁহার পণ্ডিচারী-যাত্রার আলেখ্যও আমার অন্তরে চিরমুদ্রিত থাকিবে। এই কাহিনী বর্ণনা করিতে শ্রীশচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীসুদর্শন চট্টোপাধ্যায় আর ফিরিয়া আসিবেন না। উত্তরপাড়ার শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায় এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করার যুগে এখনও বিদ্যমান আছেন। আর আছেন ৺কৃষ্ণকুমার মিত্রের সুযোগ্য সন্তান শ্রীসুকুমার মিত্র। তাঁহাদের সাহায্যেই তিনি নিরাপদে জাহাজে চড়িয়া পণ্ডিচারী যাত্রা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই এই সংবাদ পণ্ডিচারীর নির্ব্বাচিত কয়েক জন নেতৃ-পুরুষদের নিকট জানান হইয়াছিল। তাঁহাদের নাম এইখানে নিশ্চয় উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা কয়জনই ত্রিচিনপল্লী ষ্টীমারপরিচালনার উদ্যোক্তা-পুরুষ ছিলেন। স্বদেশীর অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াই তাঁহারা পণ্ডিচারীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন ডি, এস, আয়ার, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার আর তামিলের প্রসিদ্ধ জাতীয় কবি ভারতী। শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের সুযোগ্য ভ্রাতা পার্থসারথির সহিত শ্রীঅরবিন্দের নির্দ্দেশে পরবর্ত্তী যুগে বহুবার আমায় মিলিত হইতে হইয়াছে, সে কথা আমি পরে প্রকাশ করিব।

ফাল্গুনের শেষে অথবা চৈত্রমাসের প্রথম সপ্তাহে শ্রীঅরবিন্দ প্রস্থান করিলে আমরা নূতনভাবে বিপ্লব-সংহতি গড়িয়া তুলিতে উদ্বুদ্ধ হই।

আমায় কেন্দ্র করিয়া শ্রীশচন্দ্র বাহিরের বিপ্লব-সংহতিগুলির সহিত সংযোগ-রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। আশুতোষ নিয়োগী, নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ—ইহারা স্থানীয় সংহতির সর্ব্বপ্রথম হোতার আসন গ্রহণ করেন। আমার অন্তরঙ্গ সাথী সঙ্গিগণও এই বিপ্লবের কাজে সহায়তা করেন। শুধু পুরুষ নহে, তিন জন সহযোগিণী নারীও আমরা এই কর্ম্মে বিশেষ সহায়িকা হইয়াছিলেন। ইহাদের একজন আমার পত্নী, অন্য দুইজন আমার বাল্যবন্ধু সাগরকালী ঘোষের মাতা ও বনিতা।

আমরা ব্যতীত বাংলায় যে অন্যান্য বিপ্লব-সমিতির অস্তিত্ব ছিল না, তাহা নহে; তবে আমরাই বাংলার বিপ্লব-সংহতিগুলিকে এক সূত্রে সংযুক্ত করার প্রথম চেষ্টা করি।

শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচারী-প্রস্থানের পর তাঁহার নির্দ্দেশ-প্রতীক্ষায় কিছুদিন অতিবাহিত করি। তারপর সুদর্শন চট্টোপাধ্যায়কে পণ্ডিচারী-প্রেরণের ব্যবস্থা হয়। সুদর্শন ফিরিয়া আসিলে শ্রীঅরবিন্দের যে পত্র তিনি আমায় দেন, তাহার একখানি শুধু আমারই জন্য অধ্যাত্ম-সঙ্কেত বহিয়া আনিয়াছিল। অন্য পত্রে তিনি বাংলার সহিত পণ্ডিচেরীর সংযোগ-রক্ষার জন্য এক ভদ্রলোকের ঠিকানায় পত্রাদি প্রেরণের ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করেন। এই ভদ্রলোক চন্দননগর ও পণ্ডিচারীর পত্র প্রেরণের ডাকঘর-রূপে কিছুদিন কার্য্য করিয়াছিলেন। ইঁহার নাম মন্মুথম্ চেট্টি।

এই সময়ে হাওড়ায় ৫০ জন তরুণ লইয়া রাজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার অভিযোগে মোকদ্দমা চলিতেছিল। বিঘাটি, রৈতা, মরিহান, নেত্রা, হলুদবাড়ী প্রভৃতির মোকদ্দমাও জোর চলিয়াছে। ডাকাতির সংবাদ রোজই সংবাদপত্রে বাহির হয়। পিস্তল লইয়া যেখানেই ডাকাতির খবর সংবাদপত্রে প্রকাশ পায়, সেইখানেই বিপ্লবীদের গন্ধ বাহির

করিতে পুলিস হানা দেয়। খুলনা, যশোহর, কলিকাতা, ঢাকা, হুগলী প্রভৃতি স্থানে ডাকাতির হিড়িক পড়ে। খুলনার ডাকাতির সম্পর্কে ১৭ জনের বিচার কলিকাতার হাইকোর্টে আসিলে, বিচারপতি প্রমাণের অভাবে সব অভিযুক্ত আসামীকেই ছাড়িয়া দেন। দেশে উল্লাসের সাড়া পড়িয়া যায়। বাংলার পুলিসদের তদন্তের সীমা থাকে না। খানা-তল্লাসীর সংবাদ প্রতিদিনই সংবাদপত্রে বাহির হয়। বাংলার বিপ্লববাদের সহিত পঞ্চনদ ও মহারাষ্ট্র সমতালে চলিতে থাকে। ভাই পরমানন্দ দয়ানন্দ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। লালা লাজপৎ রায়ের বিলাতে অবস্থান কালে তাঁহার সহিত গোপনপত্র-ব্যবহারের দায়ে তিনি অভিযুক্ত হন। পাঞ্জাবের অজিত সিংহ আত্মগোপন করিয়া বিপ্লব-কর্ম্মের সহায়তা করিতেছিলেন। পাঞ্জাবের শাসনকর্ত্তৃপক্ষগণ আর্য্যসমাজকেই বিপ্লব-কেন্দ্র সংজ্ঞা দিয়া ধ্বংস করার প্রচেষ্টা করিতেছিলেন। মহারাষ্ট্রের চিৎপাবন ব্রাহ্মণেরাও বিপ্লবী বলিয়া পুলিস কর্ত্তৃক আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে অগ্নিযুগের ইতিহাস আজিও রক্ত চঞ্চল করে। সৌভাগ্যের কথা, বাংলার কেন্দ্র হইতেই ভারতে বিপ্লবতন্ত্র প্রসারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। তাহারই কথা আমি পরে বিবৃত করিতেছি।

বীরেন্দ্রের ফাঁসী ও স্বীকারোক্তির ফল

২৪শে জানুয়ারী ১৯১০ সালে বীরেন্দ্র দত্তগুপ্ত সামসুল আলম্‌কে নিহত করেন, একথা পুর্ব্বেই লিখিয়াছি। এই সামসুল আলমের হত্যা করার কথা অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবে, কেন-না এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়াই শ্রীঅরবিন্দকে ভারতের হৃদয়-ভুমি বাংলা ত্যাগ করিতে হয়। বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্তের ফাঁসীর হুকুম হইল ৭ই ফাল্গুন ১৩১৬ সালে। বৈপ্লবিক হত্যাকাণ্ডে সোজাসুজি লিপ্ত হন যাঁহারা, তাঁহারা ধৃত হইলে যে অত্যাচার তাঁহাদের উপর চলিয়া থাকে, তাহাতে কখনও-কখনও

বাধ্য হইয়া অনেক ঘরের কথা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সে যুগে বিপ্লবীদের ধৃত করিয়া দিবারাত্র দণ্ডায়মান অবস্থায় রাখার সংবাদ আমরা পাইয়াছি। তৃষ্ণাকাতর হইয়া কেহ জল চাহিলে, কাঁচের গ্লাসপূর্ণ মূত্র মুখে ধরা হইয়াছে। কাহাকেও-কাহাকেও এমন প্রহার করা হইত— স্বীকারোক্তি না করিলে, তাহার প্রাণ-নাশেরও সম্ভাবনা থাকিত। এই অবস্থায় বহু তরুণ নির্য্যাতনে অতিষ্ঠ হইয়া গোপন কথা কিছু-কিছু ফাঁস করিয়া দিতেন। বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্তের স্বীকারোক্তি বাংলার বিপ্লব-সংহতির মূলে কিছু ঘা দিয়াছিল, এ কথা বুদ্ধিমান্ পাঠকবর্গ অনায়াসেই বুঝিবেন। পরলোকগত মিষ্টার জে, এন, রায় এই তরুণের প্রাণদণ্ডাদেশ পিছাইয়া দেওয়ার অনুরোধ করিয়াছিলেন তাৎকালীন ছোটলাট বাহাদুরের নিকট। কিন্তু তিনি ব্যর্থকাম হন। বীরেন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তি সমর্থন করার জন্য ফাঁসীর প্রাতঃকালে মিষ্টার জে, এন, রায়কে পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার সুইন্‌হো জেরার অনুরোধ করেন। মিষ্টার জে, এন, রায় এই আসন্ন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত তরুণকে জেরা করিতে অসম্মত হইয়া, তাহার দণ্ডাদেশ এক সপ্তাহকাল পিছাইয়া দিবার অনুরোধ করেন ; কিন্তু ছোটলাট বাহাদুর সে অনুরোধ উপেক্ষা করেন। তিনি এই ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড এক মিনিট কাল অপেক্ষা করা যায় না বলিয়া আদেশ দেন। বীরেন্দ্রনাথের ফাঁসী হইয়া যায়। তাহার স্বীকারোক্তির অনেকাংশ বাদ দিয়া যেটুকু আমাদের হস্তগত হয়, তাহাই এই ক্ষেত্রে প্রকাশ করিতেছি। বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্তের স্বীকারোক্তিতে পাওয়া যায় যে, আলমের হত্যার কয়েক মাস পূর্ব্বে জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র কর্ত্তৃক সে যতীন্দ্রের সহিত পরিচিত হয়।

বীরেন্দ্র প্রথমে যতীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, রামসদয় মুখোপাধ্যায়কে হত্যা করা হইবে কি-না ! কিন্তু যতীনবাবু বলেন যে, তাহার হত্যার আবশ্যকতা নাই। তারপর বীরেন্দ্র যতীন্দ্রকে জিজ্ঞাসা

করে যে, তাহারা ডাকাতি করিবে কি-না ! তাহাতে যতীনবাবু বলেন যে, ইহাতে দেশের অনেক ক্ষতি হইবে। পরে বীরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করে যে, সে সামসুল আলমকে হত্যা করিবে কি-না ! তাহাতে যতীন স্বীকৃত হন এবং বীরেন্দ্রকে সতীশ নামক এক ব্যক্তির নিকট পাঠাইয়া দেন। ঐ সতীশই বীরেন্দ্রকে কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে রিভলভার, গুলী, টোটা ইত্যাদি দিয়াছিল এবং হাইকোর্টে লইয়া গিয়াছিল। বীরেন্দ্র বলিয়াছিল যে, সে এইরূপ জবানবন্দী দিতেছে, তাহার কারণ—প্রথমতঃ, তাহার পরিবারকে সাধারণ লোকে যে নিন্দা করিতেছে, তাহা হইতে উহাকে রক্ষা করা ; দ্বিতীয়তঃ, কেবল এইরূপ রাজকর্ম্মচারী হত্যার দ্বারাই দেশের উদ্ধার হইবে না, তাহা সাধারণে প্রকাশ করা।

যতীন্দ্রনাথ তখন লাট-দপ্তরে কর্ম্ম করিতেন, বীরেন্দ্রের এই উক্তির পর তাঁহাকে ধৃত করা হয়। সতীশকে পুলিস খুঁজিয়া পায় না। যতীন্দ্রনাথের পরিচয় দেশের কাছে এই প্রথম জাহির হইল। ইনি "বাঘা যতীন" নামে বন্ধুদের নিকট পরিচিত ছিলেন। পুলিস-ম্যাজিষ্ট্রেট সুইন্‌হোর এজলাসে ব্যারিষ্টার জে, এন, রায় তাঁহার পক্ষ সমর্থন করেন। ১৯১০ সালের ৭ই মার্চ্চ, এই নূতন মোকদ্দমা সুরু হয়। শ্রীঅরবিন্দের সহিত বাঘা যতীন্দ্রের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। এই ঘটনায় শ্রীঅরবিন্দকেও জড়াইবার প্রয়াস হইল। ভগ্নী নিবেদিতা কর্ত্তৃপক্ষ-মহল হইতে সেই সংবাদ পাইবা মাত্র তাহা শ্রীঅরবিন্দের গোচরীভূত করেন। ইহার পরেই অন্তরের নির্দ্দেশ পাইয়া শ্রীঅরবিন্দ প্রথমে ফরাসী রাষ্ট্র চন্দননগরে ও পরে পণ্ডিচারীতে আত্মগোপন করেন।

সুরেশচন্দ্র ও বোমাপ্রস্তুতি-শিক্ষা

শ্রীঅরবিন্দ প্রস্থান করার সময়ে এক ব্যক্তির সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দেন। সেই ব্যক্তির সহিত প্রথম আলাপের যেরূপ কৌশল অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহা উল্লেখযোগ্য। আমরা অপরিচিতের সহিত তখন এই ভাবেই পরিচয় করিতাম। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখর রৌদ্রে কলিকাতার পথ শূন্যপ্রায়। সেদিন কলিকাতার রাজপথে এত ভীড় হইত না। আমি বহুবাজার ষ্ট্রীটে গিয়া ইতস্তত: দৃষ্টিপাত করিলাম। চার্ণক সাহেবের বাড়ীর সম্মুখে একটি ল্যাম্প-পোষ্টের গোড়ায় দাঁড়াইয়া এক চশমাধারী যুবক একখানি বিজ্ঞাপনের কাগজ আঙ্গুলে জড়াইতেছে এবং আবার খুলিতেছে—লক্ষ্য করিলাম। এই নিদর্শন এই স্থানে যিনি দেখাইবেন, তিনিই হইবেন আমাদের অভিলষিত মানুষ, তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানিয়াছিলাম। আমি তাঁহার নিকট ধীরে-ধীরে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনার নাম কি মহাশয় ?"

তিনি আমার দিকে চাহিয়া, হাসিয়া বলিলেন "বিরূপাক্ষ"। আমি তাঁহার গলা ধরিয়া বলিলাম "আপনি আমাদের সুরেশচন্দ্র।" সে ব্যক্তিও যেন স্বর্গ হাতে পাইলেন। দুই জন হাসিতে-হাসিতে অনেক কথা হইল। মাণিকতলার বাগানে হেমচন্দ্র দাস বোমা প্রস্তুত করিতেন বলিয়া খ্যাতি আছে। কিন্তু এই অখ্যাত সুরেশচন্দ্রের নাম অনেকেই জ্ঞাত নহেন। ইনি তখন এম-এস্‌-সি ক্লাসে অধ্যয়ন করিতেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দ হইতে বোমার কাণ্ড যতগুলি ঘটিয়াছে, সুরেশচন্দ্র ছিলেন সেই বোমাগুলির নির্ম্মাতা। সুরেশচন্দ্র দত্তের জীবনের ক্রটি দুঃখের সহিত পরে বলিতে হইবে। কিন্তু তিনিই শ্রীঅরবিন্দের প্রস্থানের পর বোমার সন্ধান আমাদিগকে দিয়াছিলেন।

আমি সুরেশচন্দ্রের সহিত আলাপ করিয়া চন্দননগরে ফিরিলাম। তখন গোপনে কথা কহিবার স্থান কোন লোকালয়ে হওয়া সঙ্গত মনে হইত না। চন্দননগরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে রেল লাইনের ধারে গোঘাটায় মধ্য নিশীথের এক বিপ্লব-সভায় সুরেশচন্দ্রের সহিত আমার কথোপকথনের সংবাদ দেওয়ার নির্দ্দেশ হইয়াছিল। আমি তদনুযায়ী আমার আলো-ও-বেল-বিহীন বাইকটিতে চড়িয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ভারত স্বাধীন করার প্রেরণা গোড়া হইতেই হৃদয়ে ফুটিয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দের সহিত পরিচয়ের পরে ইহা একটি পবিত্র ব্রতরূপে অনুভূত হইত। নির্দ্দিষ্ট সময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখি—সেখানে আর কেহ নাই, শুধু আমি আর আমার নিঃশ্বাস প্রচণ্ড শব্দে নির্গত হইতেছে। রেল লাইন আঁকিয়া-বাঁকিয়া বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে। চতুর্দ্দিকে ঘন বনরাজি। জোনাকীর আলো জ্বলিতেছে। সে কি নিস্তব্ধতা! সহসা একদল শৃগাল বিকট চীৎকার সুরু করিল। কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময়ে দূরে পদশব্দ শ্রুত হইল। আমিও সেই শব্দ অনুসরণ করিয়া চলিতে সুরু করিলাম। দুইজনের সাক্ষাৎকার হইল। আমার পরিচিত বন্ধু শ্রীশচন্দ্র! আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "বিপ্লবীদের সভা হইবার কথা, যথাসময়েই আমি আসিয়াছি। কাহাকেও না দেখিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিবার কথা ভাবিতেছিলাম। হঠাৎ তোমার পদশব্দে মনে হইল—কে আসিতেছে। আর সকলে কোথায়?"

শ্রীশচন্দ্র মিষ্টভাষী, হাস্য তাহার ওষ্ঠপুটে লাগিয়াই আছে। সে হাসিয়া বলিল "তুমি যে আসিবে, ইহা বুঝিয়া আমি একাই তোমার সহিত দেখা করিতে আসিলাম, অন্য সকলে আমাকেই তাহাদের প্রতিনিধি-রূপে পাঠাইয়াছে। এক্ষণে সুরেশবাবুর সহিত সাক্ষাৎকারের ফলাফল কি হইল, জানিতে চাই।"

আমি শ্রীশচন্দ্রকে সব কথা বলিলাম ও জানাইলাম যে, কিছু টাকা সুরেশবাবুকে পাঠাইতে হইবে। বরাহনগরে তিনি বোমা-প্রস্তুতির ব্যবস্থা করিয়াছেন। যদি আমরা তেমন বিশ্বাসী লোক দিতে পারি, তিনি তাহাকে বোমা তৈয়ার করার প্রণালী শিক্ষা দিতে পারেন। শ্রীশচন্দ্র বলিল যে, টাকা কিছু দিতে হইবে। কিন্তু বিষয়টা শিক্ষা করার ব্যবস্থা চন্দননগরেই করিতে হইবে। সে ব্যবস্থার ভার সে লইতে পারিবে।

বিপ্লবী বলিয়া যে সকল তরুণদের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে রাসায়নিক শিক্ষা কাহার আছে ভাবিতে লাগিলাম। আমি চন্দননগরের কোন্ লোকের দ্বারা এই কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে, ইহা জানিতে চাহিলে, শ্রীশচন্দ্র আমার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল "তোমাকে সকলের কথা এখনও বলি নাই। হাটখোলায় নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ক্যাম্বেলে ডাক্তারী পড়িতেছে। সুরেশবাবুর সহিত তাহাকেই পরিচয় করাইয়া দিতে হইবে।"

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষকে আমি চিনিতাম। এই কর্ম্মের পক্ষে তিনি দক্ষ ব্যক্তিই। আমি সম্মতি দিয়া বাড়ী ফিরিলাম। শ্রীশচন্দ্রও অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রতিদিন বৈপ্লবিক কর্ম্মের সংবাদ বাহির হয়। আমরা উৎসাহের সহিত তাহা পাঠ করি। চন্দননগরের বিপ্লব-সমিতি ডাকাতি করিতে চাহে নাই। তাহারা ছিল স্বাধীনতাকামী। সন্ত্রাসবাদের মধ্য দিয়া দেশে বিপ্লব আনারও তাহাদের ঝোঁক ছিল। পক্ষান্তরে ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে যে সকল ডাকাতি হইত, সেগুলির মধ্য দিয়া অর্থ-সঞ্চয়-পূর্ব্বক অস্ত্র-সংগ্রহ করিয়া বিপ্লবের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল পূর্ব্ববঙ্গ-সমিতিগুলির লক্ষ্য। আমরা সুরেশবাবুর সহিত নগেন্দ্রনাথের পরিচয় করাইয়া বোমা-নির্ম্মাণের কৌশল-শিক্ষা করাইবার

ব্যবস্থা করিলাম। নগেন্দ্রনাথ কলিকাতায় থাকিয়া সুরেশচন্দ্রের নিকট হইতে বোমা তৈয়ারী শিক্ষা করিয়া, চন্দননগরে যাহাতে তাহার নির্ম্মাণ-কেন্দ্র সংস্থাপিত হয়, সেই দিকে মনোযোগী রহিলেন। ধীরে-ধীরে চন্দননগরে একটী শক্তিশালী বিপ্লব-কেন্দ্র ও তৎসহ বোমা-নির্ম্মাণের কারখানা গড়িয়া উঠিল।

১৫ই আগষ্ট কালীপূজা

আগষ্ট মাসের গোড়ায় শ্রীঅরবিন্দের এক পত্র পাইলাম। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, ১৫ই আগষ্ট কালীর জন্মদিন। ঐ দিনটি পালন করার সঙ্কেত পাইয়া পুলকিত হইলাম। তখন শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং "কালী" নামেই তাঁহার পত্রগুলিতে স্বাক্ষর করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা জানিতাম—১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দেরই জন্মদিন। তাঁর মধ্যে দিব্যভাবে স্বয়ং কালীশক্তিই অবতীর্ণা। স্থির করিলাম —১৫ই আগষ্টের উৎসব মহানিশাতে অনুষ্ঠিত হইবে। এই দিন আমরা কলিকাতায় বিপ্লবের কোনরূপ লক্ষণ প্রকাশ করিব বলিয়াও প্রতিশ্রুতি লইলাম। ১৫ই আগষ্টের মধ্যরাত্রে চন্দননগরে বিপ্লবিগণ একসঙ্গে সমাগত হইল। আমরা এই রাত্রিতে স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সঙ্কল্প লইলাম—সন্ত্রাসবাদের মধ্য দিয়া শাসনশক্তির গোড়া শিথিল করিব। শাসকেরা বাধ্য হইয়া নূতন শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তন করিবে। আমরা স্বায়ত্ত শাসন লাভ করিয়া ধীরে-ধীরে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইব। চন্দননগরের বিপ্লব-কেন্দ্রের ইহাই ছিল মৌলিক প্রতিজ্ঞা।

ঘনায়মান বর্ষার আকাশ। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। আমরা বাড়ীর দালানে বসিয়া ১৯।২০ জন যুবক পত্রপুষ্প-সজ্জিত শ্রীঅরবিন্দ-চিত্রের দিকে চাহিয়া, দৃঢ় কণ্ঠে বিপ্লবতন্ত্রে দীক্ষা আবার নূতন করিয়া গ্রহণ

করিলাম। সেইদিন হইতে চন্দননগরের এই বিপ্লব-কেন্দ্র সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা-লাভের মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে। শ্রীঅরবিন্দের এই সর্ব্ব-প্রথম আত্মগোপনের ক্ষেত্রটিও তাই চির-স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আমাদের এই পুণ্যতীর্থে নিখিল-ভারত বিপ্লবনেতৃগণের আগমন-সংবাদ যথাসময়ে দিব।

সভা শেষ হইলে, অন্নপাত্র হাতে অবগুণ্ঠনবতী গৃহদেবীর আহ্বান কেহই উপেক্ষা করিল না। সেদিন শ্রীঅরবিন্দের প্রমাণাকৃতি ফটোখানি সম্মুখে রাখিয়া আমরা জাতি-নির্ব্বিশেষে প্রসাদ গ্রহণ করিলাম। সে কি পরিপূর্ণ আত্মীয়তার অমৃতাস্বাদ! আমরা আহারান্তে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া ভবিষ্য স্বাধীন-ভারত-রচনার মহাব্রত আরও দৃঢ় করিয়া গ্রহণ করিলাম।

রাত্রির অন্ধকারে ১৫ই আগষ্ট উৎসবের এই প্রথম আয়োজন। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে রাজধানী কলিকাতার বুকে আবার একদিন শ্রীঅরবিন্দের জন্মোৎসবে, একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে আমাকেই যখন মহাগুরুর প্রতিমূর্ত্তির আবরণ মুক্ত করিতে হইয়াছিল, মহাসমারোহময় সেই উৎসবকালে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের এই অনাড়ম্বর ও গোপন প্রথম উৎসবের চিত্রই চিত্তে পুণ্যস্মৃতিরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। স্বাধীনতা-লাভের সেই পবিত্র আগ্রহ আজ পূর্ণ হইয়াছে কি-না, বিধাতাই তার সাক্ষী। বিপ্লবী আজও চলিয়াছে। সংগঠনের মন্ত্র তার কণ্ঠে। ভারতে পূর্ণ স্বাধীনতার রূপ গড়ার যুগ সমাগত। 'স্বরাজ গড়' বলিয়া বাংলার ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় আত্মদানের রক্তে বাংলার মাটি ভিজাইয়া গিয়াছেন। বাংলার বিপ্লবী অমর হইয়া আজ পূর্ণাঙ্গ স্বরাজই গড়িয়া তুলিবে। সেই সঙ্কল্প বিসর্জ্জন দিবার দিন আজিও আসে নাই।

চন্দননগরের বোমা

নগেন্দ্রনাথ কলিকাতায় থাকিয়া সুরেশচন্দ্র দত্তের নিকট হইতে বোমাপ্রস্তুতির প্রণালী শিখিয়া লইলেন। অতঃপর আর কাহাকেও উহা শিখাইয়া দিবার জন্য তিনি নিবেদন জানাইলেন। এই কর্ম্মের জন্য এই সময়ে যে অর্থের প্রয়োজন হইত, তাহা মিটাইতেন চন্দননগরের বিপ্লব-পন্থী আমাদের পরম সুহৃৎ আশুতোষ নিয়োগী। আশুতোষ নগেন্দ্রেরই ভাগিনেয়। ইনি চন্দননগর বিপ্লব-কেন্দ্রকে গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করেন প্রচুর অর্থদানে। চন্দননগর-নেতা চারুবাবু এখানকার বিপ্লব-পন্থিগণকে লইয়া করের বাগানে যে সারস্বত উৎসবের আয়োজন করেন, সেই কার্য্যের জন্যও আশুতোষের দান সর্ব্বপ্রধান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বোমা-প্রস্তুতির জন্য তিনি এক রাশ গিনি প্রদান করেন, সে কথা পরে বলিব। আজ আশুতোষ ইহলোকে নাই। ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন সফল হইয়াছে, তাহা দেখিয়া যাওয়ার অদৃষ্ট তাঁহার হয় নাই। তবুও স্বাধীনতার অকৃত্রিম সেবকরূপে আমি তাঁহাকে চিরদিন স্মরণ রাখিব। বিপ্লবযজ্ঞের অন্যতম সহায়করূপেই তাঁহাকে আমরা পাইয়াছিলাম। আজও তাঁহার পবিত্র স্মৃতি অন্তরে আঁকিয়া আছে।

নগেন্দ্রের প্রস্তাব লইয়া শ্রীশচন্দ্রের সহিত আমাদের পরামর্শ হইল। নগেন্দ্রর পক্ষে পারিবারিক কারণে বিপ্লব-সংহতির সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করা আর সম্ভবপর হইতেছিল না। শ্রীশচন্দ্রের সহিত এই বিষয় লইয়া আলোচনার পর, আর একজন তরুণকে বোমা শিখাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল। আমার তরুণ বন্ধু মণীন্দ্রনাথ নায়েককেই এই কার্য্যের জন্য আমি উপযোগী মনে করিলাম। মণীন্দ্রনাথ আমার নিকট-প্রতিবেশী। ১৯০৬-৭ সালে কানাইলাল তদীয় ভবনে যে লাঠী ও বক্সিং খেলার আখড়া সংস্থাপন করে, মণীন্দ্রনাথ সেই ব্যায়াম-ক্ষেত্রে প্রতিদিন আগমন

করিত এবং আমার রবিবাসরীয় সাংস্কৃতিক বিভাগেও আমার উক্তিগুলি মন দিয়া শুনিত। কানাইলালের ফাঁসীর পর মণীন্দ্রনাথের সহিত বিপ্লব-সংক্রান্ত কথাবার্ত্তাও কহিতাম। সে তখন এম-এস-সি ক্লাসের ছাত্র। উপযুক্ত আধার মনে করিয়া তাহাকেই নগেন্দ্রনাথ ঘোষের নিকট হইতে বোমা শিখিয়া লওয়ার নির্দ্দেশ দিলাম। সে আনন্দের সহিত তাহা বরণ করিয়া লইল। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের পর, মণীন্দ্রের বাড়ীতে আসিয়াই নগেন্দ্রনাথ বোমা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। দুই মাসের মধ্যেই মণীন্দ্র কৃতকার্য্য হইল এবং ডিসেম্বর মাসে একটী বোমা প্রস্তুত করিয়া সুরেশচন্দ্র দত্তের নিকট পাঠাইয়া দিল। সুরেশবাবু আনন্দের সহিত জানাইলেন যে, বোমাটী উত্তমরূপেই প্রস্তুত হইয়াছে। তাঁহার সমর্থন লাভ করিয়া আমরা বোমাটী সযত্নে রক্ষা করিলাম এবং উক্ত আদর্শেই আরও বোমা-নির্ম্মাণের আয়োজন চলিতে লাগিল। বোমা-নির্ম্মাণের কারখানা প্রথম স্থাপিত হইয়াছিল আমারই বাড়ীতে। তারপর উহা স্থানান্তরিত করা হয় আমাদের কাঠের কারখানায়। পরিশেষে মণীন্দ্রনাথের নিজ ভবনেই নিরাপত্তা-প্রয়োজনে উহা স্থানান্তরিত করা হয়। রাজকর্তৃপক্ষের নিকট নিতান্ত ভয়াবহ বলিয়া পরিচিত "চন্দননগরের বোমা" এই কেন্দ্রেরই বিশিষ্ট ঐতিহাসিক অবদান।

পুলিনদাস ও অনুশীলন-সমিতি

এদিকে পূর্ব্ববঙ্গের বৈপ্লবিক আন্দোলন দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। পুলিনবাবুর অনুশীলন সমিতিই বিশেষ কর্ম্মতৎপর হইয়া উঠায়, পুলিনবাবুকে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে রাজবন্দীরূপে আটক রাখার পর, ১৯১০ খৃষ্টাব্দে মুক্তি দেওয়া হইলেও, তাঁহার প্রতি নির্য্যাতনের অভাব হইল না। ১৯১০ সালের জুলাই মাসেই তিনি "অনুশীলন সমিতির" রাজদ্রোহকর কার্য্যকলাপের জন্য ধৃত হইয়া ৭ বৎসর কারাদণ্ড প্রাপ্ত

হন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দেই বাংলার সংবাদপত্র "যুগান্তর" বন্ধ হইয়া যায়। এই সময় হইতেই "স্বাধীন ভারত" নামে অপর একখানি কাগজ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে। পরে এই কাগজখানির লেখার দায়িত্ব আমাকেও গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

পুলিনবাবু প্রমুখ কয়েক জন নেতা কারাদণ্ড লাভ করিলে, ঢাকার "অনুশীলন সমিতি" পূর্ব্ববঙ্গে বিপ্লবের আগুন আরও অধিক প্রজ্জ্বলিত করেন। এই সময়ে যে ১৮টী লোমহর্ষণকারী বৈপ্লবিক ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহার ১৬টী ঘটিয়াছিল পূর্ব্ববঙ্গেই এবং সেই কর্ম্ম "অনুশীলন সমিতির" দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে সোণারং জাতীয় বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। পুলিনবাবু কারাবরণ করিলে, এই সোণারং জাতীয় বিদ্যালয়ের ১৪ জন শিক্ষকের সহিত ৭০ জন ছাত্র বিপ্লবযজ্ঞ পরিচালন করেন। সংবাদ-পত্র পড়িয়া তরুণের প্রাণ উল্লসিত হইয়া উঠে। রসুল দেওয়ান নামক এক ব্যক্তি গোয়েন্দা পুলিসের সাহায্যকারী হওয়ায়, সোণারংএ তাহাকে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইতে-না-হইতেই ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় রাজপক্ষের সাক্ষী মনোমোহন দাসকে হত্যা করা হয়। বিপ্লবের পরিপন্থী পুলিস কর্ম্মচারিবৃন্দ এই সময়ে সহজে নিষ্কৃতি পাইত না। রাজকুমার দে নামক একজন সাব্-ইন্স্পেক্টর ময়মনসিংহে বিপ্লবীর হস্তে নিহত হয়। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় বিশেষভাবে ইন্স্পেক্টর মনোমোহন ঘোষ কর্ম্মতৎপর হইয়াছিলেন, বরিশালে তাঁহাকেও হত্যা করা হয়। চাঞ্চল্যের সীমা থাকে নাই। তরুণের প্রাণে এই সকল ঘটনায় আশা ও উৎসাহের সঞ্চার হইত। এই সকল খবর সংবাদপত্রে তখন ঘটা করিয়া বাহির হইত।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের রাজকীয় ঘোষণায় বঙ্গভঙ্গ-রোধ হইয়া গেল। ইংরাজ মনে করিয়াছিল যে, এই বঙ্গ-ভঙ্গের জন্যই তরুণের প্রাণ চঞ্চল হইয়াছে, এইবার তাহা প্রশমিত হইবে। বঙ্গভঙ্গ বন্ধ হওয়ায়,

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবর্গ স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িলেন। বাংলার তরুণ প্রাণ কিন্তু বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ্যে জাগিলেও, তাহাদের চাওয়া ছিল ভারতের স্বাধীনতা। তাই বঙ্গভঙ্গ-রোধ হইলেও, বাংলার প্রাণ স্তব্ধ হইল না। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের প্রথমেই রাজকীয় ঘোষণার প্রচার হওয়া সত্ত্বেও, ২১শে ফেব্রুয়ারী শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামে এক হেড-কনষ্টেবল কলিকাতায় নিহত হইল। ইহা কলিকাতার "অনুশীলন সমিতির" কাজ বলিয়া আমাদের নিকট অনুমিত হইল। আমাদের তাজা বোমার সদ্ব্যবহার করিবার ইচ্ছা এই সময়ে জাগিল। কলিকাতার "অনুশীলন সমিতি" ঢাকার "অনুশীলন সমিতির" সহিত একযোগে ইন্‌স্পেক্টর, সাব্‌-ইন্‌স্পেক্টর, হেড-কন্‌ষ্টেবল প্রভৃতিকে হত্যা করিয়া চলিয়াছে। চন্দননগরও একটা বৃহৎ কাণ্ড সৃষ্টি করিতে চাহিল। সভা বসিল। এই সভায় স্থির হইল যে, গোয়েন্দাবিভাগের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তাকে নিহত করিতে হইবে। ডেনহ্যাম সাহেব তখন ছিলেন গোয়েন্দাবিভাগের এরূপ এক উচ্চতম কর্ম্মকর্ত্তা। সভায় স্থির হইল যে, ডেনহ্যাম সাহেবকেই হত্যা করিতে হইবে।

অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র
বীরবালক ননীগোপাল ও ডেনহ্যাম-হত্যা-প্রচেষ্টা

অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ চন্দননগর বিপ্লব-কেন্দ্রের একজন প্রধান সাথী ছিলেন। তিনি হুগলী কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। কলেজের ছাত্রগণকে তিনি স্বাধীনতার প্রেরণা দিতেন। ছাত্রগণ এরূপ একজন অধ্যাপকের প্রতি অতিশয় অনুরাগী হওয়ায়, কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে বিদায় দিতে বাধ্য হন। তিনি বহু তরুণের প্রাণ লইয়া খেলিতে চিরদিন ভালবাসিতেন। আজিও তাঁহাকে তরুণের দলে বসিয়া হাস্য-পরিহাস করিতে দেখা যায়। শ্রীশচন্দ্র ঘোষের সহিত পরামর্শ করিয়া

তিনি ষোল বছরের এক বালক ননীগোপাল মুখার্জ্জীকে ডেনহামকে হত্যা করার জন্য নিয়োগ করিলেন। আমাদের প্রস্তুত বোমার দ্বারাই তাঁহাকে নিহত করা হইবে, ইহাই স্থির হইল। চন্দননগরের নরেন্দ্রনাথ, বসন্তকুমার ও শ্রীশচন্দ্র ডেন্হামের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রতিদিন রাত্রে সংবাদ পাইতাম—ডেনহাম সাহেব কোন্ সময়ে বাসা হইতে বাহির হন, কখন হোটেলে আমোদ-প্রমোদ করেন, কোন্ সময়ে বা গড়ের মাঠে ঘোড়ায় চড়িয়া তিনি ভ্রমণ করেন, তাঁহার পশ্চাৎ এইরূপ অনুধাবন চলিতে লাগিল। শেষে স্থির হইল—রাইটার্স বিল্ডিং হইতে যখন তিনি মোটর গাড়ীতে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সেই সময়ে তাঁহার গাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ করিতে পারিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। চন্দননগরের এই প্রথম সন্ত্রাসমূলক উদ্যম সুসম্পন্ন হইলে, বিপ্লবী জগতে একটা হুলুস্থূল পড়িবে।

ডালহাউসী স্কোয়ারে দিনের পর দিন ডেন্হামের গাড়ী লক্ষ্যে রাখা হইল। কিন্তু ডেনহাম সাহেবকে সে গাড়ীর মধ্যে আর দেখা যায় না! ১৬ বৎসরের বালক ননীগোপাল বোমা হাতে প্রতিদিন ডালহাউসী স্কোয়ারে দাঁড়াইয়া থাকে, সন্ধ্যার পর অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্রের নিকট আসিয়া বলে—ডেনহাম সাহেবের গাড়ী আর সে দেখিতে পায় না; বোধহয় সাহেব আর রাইটার্স বিল্ডিংএ আসেন না। বাহিরে কোথাও বেড়াইতে গিয়াছেন।

অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র শ্রীশচন্দ্রকে ইহা জানাইলেন। ডেনহাম সাহেবের বাসায় সন্ধান করিয়া জানা গেল—তিনি কলিকাতাতেই আছেন। ননীগোপালের সহিত শ্রীশচন্দ্র ডালহাউসী স্কোয়ারে গিয়া দাঁড়াইল। আজ আর রক্ষা নাই। ডেনহাম সাহেবের গাড়ীই বটে, রাইটার্স বিল্ডিংএর সীমানা ছাড়াইয়া কিছু দূরে আসিতেই ননীগোপালের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া বোমা গাড়ীর মধ্যে পতিত হইল। চতুর্দ্দিকে

গোলযোগ উঠিল। ননীগোপাল পলায়নপর হইলেও, পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইল। ডেনহ্বামের গাড়ীতে মিষ্টার কাউলী (একজন ইঞ্জিনীয়ার) ঐদিন বাড়ী ফিরিতেছিলেন। সে গাড়ীতে বোমা পড়িল বটে, কিন্তু মিষ্টার কাউলী মরিলেন না। বোমা ফাটিল না। পুলিস বোমাটিকে লইয়া বিশ্লেষণের পর জানাইল—এ বোমা চন্দননগরের ও অতিশয় বিপজ্জনক ধরণের। বিদীর্ণ হইলে, কাউলী সাহেব আর রক্ষা পাইতেন না।

ষড়্‌যন্ত্র

বিপ্লবীদের জীবন কিরূপ দারিদ্র্যপিষ্ট ছিল, তাহার কথা এ প্রসঙ্গে অবান্তর হইলেও, উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। বাংলার বিপ্লবে সেদিন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-সন্তানেরাই যোগ দিয়াছিলেন। যাঁহারা সম্পৎশালী, গোড়ায়-গোড়ায় তাঁহাদের সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইংরাজের কঠোর শাসন বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গেই ধনিকেরা হাত গুটাইলেন। ভদ্রসন্তানগণের দুঃখের অবধি রহিল না। যাঁহারা কোনরূপ কাজ-কর্ম্মে থাকিতেন, তাঁহাদের অতি সামান্য অর্থ-দ্বারাই বিপ্লবের কর্ম্ম সিদ্ধ করিতে হইত। যাঁহারা সম্পূর্ণ-ভাবে বিপ্লবের কর্ম্মে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অবর্ণনীয় দুঃখের কথা ভাষায় প্রকাশিত হইবে না। বাংলার একদল বিপ্লবী পথে-পথে দিন যাপন করিয়াছেন। তৈলবিহীন রুক্ষ দেহ, রুক্ষ কেশ লইয়া তাঁহারা বৈপ্লবিক কর্ম্মে দিবারাত্রি শ্রম দিয়াছেন। তাঁহাদের চক্ষে ছিল অসাধারণ দীপ্তি ; কিন্তু শরীর ছিল শীর্ণ, অসুস্থ। কোনদিন অন্নজল জুটিত, কোনদিন অনাহারেই দিন কাটিত। এই দুঃখ বহন করিয়া বিপ্লবীরা যে স্বাধীনতার তপস্যা করিয়াছে, তাহার যথার্থ মূল্য বাঙালীকে আজ উপলব্ধি করিতে হইবে। আন্দোলন, আলোচনা বা অহিংস অসহযোগ নীতি পথের সহায় হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু বাংলার বিপ্লবীরাই বঙ্গভঙ্গ রোধ

করিয়াছে, শাসনসংস্কারও আনিয়াছে। আবার বাংলার বিপ্লবী সন্তান সুভাষচন্দ্র ইংরাজের উচ্ছেদ-কামনায় অস্ত্রধারণ না করিলে, ভারতের বর্ত্তমান খণ্ড স্বাধীনতাও সম্ভবপর হইত কি না, তাহাও চিন্তাশীল ঐতিহাসিকগণেরই বিচার্য্য।

শ্রীশচন্দ্র সেদিন কপর্দ্দকহীন থাকায়, চন্দননগরে ফিরিবার টিকিট কেনার অর্থাভাবে পুলিসের হস্তে ধৃত হইয়াছিল। এ দুঃখ অনপনেয়। চিরদিন নিদারুণ অর্থাভাবের কথা বাংলার বিপ্লবীদের স্মরণে থাকিবে। জাতির স্বাধীনতা-কামনায় যাহারা সর্ব্বহারা হইয়া পথে-পথে ঘুরিয়াছে, তাহাদের মুখে প্রতিদিন অন্ন দিবার সংস্থান থাকে নাই। তবুও তাহারা দেশপ্রেমে উন্মাদ হইয়া স্বাধীনতা-যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়াছে। সেইদিন ১৮টী পয়সার অভাবে শ্রীশচন্দ্র চন্দননগরে আসিতে পারে নাই। টিকিট না করিয়াও সে আসিতে পারিত, কিন্তু বিপ্লবীদের চরিত্র-বল ছিল। তাহারা দস্যুবৃত্তি করিত বটে, কিন্তু দেশের অর্থ আত্মস্বার্থে কোনদিন ব্যয় করিত না, ফাঁকি দিবার প্রবৃত্তি তাহাদের ছিল না। ফাঁকি দিলে নিজেই ফাঁকে পড়িবে, এই বোধ ছিল বলিয়াই বাংলার খাঁটি বিপ্লবীদের পূজা দিতে প্রবৃত্তি হয়।

কাউল নিহত হইলেন না। ডেনহামের পরিবর্ত্তে কাউলী সাহেবের প্রাণ-হননের অভিসন্ধি বিপ্লবীদের ছিল না। অতএব চন্দননগরের বিপ্লবিগণ বোমা বিদীর্ণ না হওয়ায়, দুঃখ করিল না : কিন্তু এই ঘটনায় শাসকমহলে চাঞ্চল্যের সীমা রহিল না। ডেনহামের মৃত্যু হইল না বটে, কিন্তু বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। বৈপ্লবিক গরম হাওয়ায় দেশের সুপ্ত প্রাণে উত্তেজনার ঢেউ বহিল। শ্রীশচেন্দ্রর সহিত অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্রও এই ঘটনায় ধরা পড়িলেন। আরও ধরা পড়িলেন চন্দন-নগরের অন্যতম বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনিও ছিলেন নীরব কর্ম্মী। অসাধারণ সাহসের পরিচয় তাঁহার জীবনে মিলিত। বিপ্লবীদের

অনেকেরই আমরা বৈকল্পিক নামকরণ করিতাম—ইঁহাকে আমরা 'হাড়ি' বলিয়াই অভিধান দিয়াছিলাম।

পুলিস বুঝিল—চন্দননগরের বিপ্লব-কেন্দ্র ভাল-ভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে। শ্রীশচন্দ্র প্রমুখ বিপ্লবীরা ধরা পড়ার পরই আমার দুয়ারে পুলিসের থানা বসিল। আর আরব্ধ হইল আমার পশ্চাদনুসরণ। এতদিন ছিলাম আমি পুলিসের সংশয়-দৃষ্টির বাহিরে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইবার মানুষ। এই ঘটনার পর হইতেই আমার গতিবিধিও পুলিসের দৃষ্টির মধ্যে নিয়ন্ত্রিত হইল। এই সকল কথার উল্লেখ পরে যথাস্থানে করিব। শ্রীশচন্দ্র প্রভৃতি ধৃত হইলে, মণীন্দ্রনাথ নায়েককে সুরেশচন্দ্রের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইল। তিনি বোমা বিদীর্ণ না হওয়ার হেতু নির্দ্ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে প্রত্যেকটী বোমা বিদীর্ণ হওয়ার ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন।

আশুতোষের কাঞ্চনদক্ষিণা

বিচারে বালক ননীগোপাল দীর্ঘ দশ বৎসরের নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত হইল। শ্রীশচন্দ্র প্রমুখ চন্দননগরের নেতৃবৃন্দ তখন কারাগারে। এই সময়ে একদিন সন্ধ্যায় আশুতোষ নিয়োগী আমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। বোমা-নির্ম্মাণের জন্য বোতল-বোতল কার্ব্বালিক, সালফিউরিক ও নাইট্রিক এসিড সংগ্রহ করিতে হইত। আমার স্বর্ণকার বন্ধু সত্যচরণ কলিকাতা ও চন্দননগরের বাজার হইতে ইহার বহুলাংশ যোগাড় করিত। আশুতোষেরও স্বর্ণকারের দোকান ছিল। তিনিও সালফিউরিক ও নাইট্রিক এসিড প্রচুর পরিমাণে যোগাড় করিয়া দিতেন। এত এসিডের বোতল আমাদের কাহারও বাড়ীতে রাখা সঙ্গত হইবে না, এই বোধে উহা ইতস্ততঃ মাটির মধ্যে পুঁতিয়া রাখা হইত। আশুতোষ নিজেই মধ্য রাত্রে আসিয়া এই কর্ম্ম সুচারুরূপে

সম্পন্ন করিতেন। এক বার গঙ্গার ঘাটে যাওয়ার রাস্তার ধারে যখন আশুতোষ মাটী খনন করিয়া বোতলগুলি প্রোথিত করিতেছিলেন, সেই সময়ে শ্মশানঘাটের কোন মুদ্দফরাস তাহা দেখিতে পায়। কোন দস্যু-তস্কর মাটীর মধ্যে ধন-সোণা পুঁতিয়া রাখিয়া যাইতেছে, এই ভাবিয়া আশুতোষের প্রস্থানের পর সেই ব্যক্তি মাটী খুঁড়িয়া অনেকগুলি এসিডের বোতল বাহির করিয়া ফেলে। সে কি মনে করিয়াছিল জানি না! তদবস্থায় এসিডের বোতলগুলিকে বাহিরে ফেলিয়া, সে চলিয়া যায়। প্রাতঃকালে স্নানার্থিরা অনেকগুলি এসিড-ভরা বোতল সন্দর্শন করিয়া পুলিসকে খবর পাঠায়। ফরাসী পুলিসেরা উহা হাস-পাতালে পাঠাইয়া দেয়। পরে ইংরাজের গোয়েন্দা পুলিস বোমা-প্রস্তুতির বিস্ফোরক উপাদানের সন্ধান পাইয়া, চন্দননগরের বিপ্লব-কেন্দ্রে কোথায় সেই নির্ম্মাণকার্য্য চলিতেছে, তাহার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হন। এই অনুসন্ধানের ফলেই কাউলীর গাড়ীতে বোমা পাইয়া তাঁহারা তার বিশ্লেষণে স্থির সিদ্ধান্তেই উপনীত হন যে, এ বোমা চন্দননগরের, অতিশয় মারাত্মক ও বিপজ্জনক বিস্ফোরক দিয়া তাহা নির্ম্মিত হইয়াছে।

আশুতোষ ছিলেন একজন অকপট বৈপ্লবিক। পিতার দোকানে বসিয়া তিনি যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতেন এবং সেই টাকার বহুলাংশ বিপ্লব-কর্ম্মে ব্যয় করিতেও তিনি অকৃপণ ছিলেন—সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেদিন আশুতোষ আমায় আসিয়া জানাইলেন যে, তিনি এই কর্ম্ম হইতে অতঃপর বিদায় লইবেন এবং বিবাহ করিবেন। আপত্তির যুক্তি ছিল না। তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। তিনি বলিলেন "পিতামাতার জিদে যখন বিবাহে রাজী হইয়াছি, তখন এই বিপৎসঙ্কুল কর্ম্মে আমার আর থাকা সম্ভবপর হইবে না। বিপ্লবের কাজে আমার অনুরাগ কোনদিন নষ্ট হইবে না। তবে এই কার্য্যের জন্য আমি একটা দক্ষিণা দিতে চাহি।" আমি বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম।

তিনি বুকের মধ্য হইতে একটা থলিয়া বাহির করিলেন ও আমার সম্মুখে ঢালিয়া দিলেন এক রাশি গিনি। রাত্রের আলোয় তাহা ঝিক্‌মিক্‌ করিয়া উঠিল। আমি বলিলাম "ইহা লইয়া কি হইবে?" আশুতোষ বলিলেন "বোমার কাজে এই অর্থ নিয়োগ করুন।" তারপর আমায় আলিঙ্গন করিয়া তিনি সজল নেত্রে বিদায় লইলেন।

আমি সেই সকল অর্থই সুরেশচন্দ্রের হাতে তুলিয়া দিলাম। বোমা-প্রস্তুতির তিনিই ছিলেন সর্ব্বময় কর্ত্তা। তখন তিনি এম-এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার মত নীরব কর্ম্মী আমি দেখি নাই; কিন্তু তিনি সেই অর্থ লইয়া বোমা-নির্ম্মাণের কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত করিলেন না, বিলাতে চলিয়া গেলেন। তিনি যখন ফিরিলেন, তখন আমাদের বিপ্লবী সুরেশচন্দ্র আর নহেন, বিজ্ঞান কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক। বিপ্লবীদের অনেক অর্থই এইরূপ ব্যক্তির স্বার্থ চরিতার্থ করিয়াছে। আমার দেশবাসী দীর্ঘদিনের পরাধীনতায় সঙ্কীর্ণ-চিত্ত হওয়ায়, এইরূপ দোষ সম্ভবপর হইতে পারে। কিন্তু সুরেশচন্দ্র—বাংলায় বোমা প্রস্তুত করার উদ্যোগী কৃতী পুরুষ—আজ পরলোকে। তাঁর এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তনের মর্ম্ম কি, এ প্রশ্নের উত্তর আমি আজও পাই নাই। বিপ্লবীদের দৃঢ় চরিত্র দেখার কামনাই ছিল, আমি অনেক ক্ষেত্রে তাহাতে ব্যর্থ হইয়াছি। জাতিনির্ম্মাণের সর্ব্বপ্রথম ভিত্তি আমাদের চরিত্রবল। চরিত্র সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ও নিঃস্বার্থ হইলে, তবেই এ জাতি ধন্য হইবে।

পার্থসারথি

প্রমাণাভাবে অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ ও নরেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেকসুর খালাস পাইলেন। শ্রীশচন্দ্র ফিরিল বটে, কিন্তু পুলিসের কড়া পাহারায় তার গতিবিধি এক প্রকার বন্ধ হইল।

অভাবে পথে বিপন্ন হইতে পারে, এই আশঙ্কায় এই সকল কার্য্য হইতে যথাসম্ভব তাহাকে দূরে রাখারই আমার ইচ্ছা ছিল। এক সময়ে পরীক্ষাচ্ছলে তাহাকে একটী এসিডের শিশি চন্দননগরে রাসবিহারী বসুর কাছে পৌঁছাইবার জন্য শ্রীশচন্দ্র প্রেরণ করে। হঠাৎ চাদরের তলায় শিশি খুলিয়া চাদরের একটী স্থানে আগুন ধরিয়া যায়। সে শিশিটী পকেট হইতে বাহির করিয়া রাস্তার উপর ফেলিয়া দেয় এবং জুতা দিয়া তাহা চাপিয়া ধরে। সৌভাগ্যক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার থাকায়, তাহা কোন পথিকের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। তদবধি, এরূপ কর্ম্মে অরুণচন্দ্রকে না লাগায়, এই নির্দ্দেশই আমি শ্রীশচন্দ্রকে দিয়াছিলাম। লর্ড হার্ডিঞ্জকে নিহত করিবার জন্য যে বোমা প্রেরণ করা হয়, তাহা নলিনচন্দ্রই লইয়া যায় এবং রাসবিহারীর হাতে নিরাপদে তাহা দিয়া সে ফিরিয়া আসে।

লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা

আমরা যথাসময়ে সংবাদপত্র খুলিয়াই দেখি—লর্ড হার্ডিঞ্জের দিল্লী-প্রবেশকালে তাঁহার গাড়ীতে বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং তাহা ভীষণ ধ্বনি করিয়া বিদীর্ণ হইলে, লর্ড হার্ডিঞ্জ অচেতন হইয়া পড়েন; কিন্তু তাঁহার প্রাণনাশ হয় নাই। তবে সহিসের প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। সমবেত জনগণের মধ্য হইতে একটা শব্দ শুনা গিয়াছিল, এক ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিল 'সাবাস মার দিয়া হায়!' সংবাদপত্র-পাঠে মানুষের উৎসাহ কিরূপ বৃদ্ধি পায়, সেদিন তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম। ঘটনাটী ঠিক কি-ভাবে কি হইল, জানিবার জন্য আমরা রাসবিহারীর পুনঃ-প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় রহিলাম। পণ্ডিচেরী হইতে শ্রীঅরবিন্দের পত্র পাইলাম, তাহাতে এই 'তান্ত্রিক ক্রিয়ার' সম্বন্ধে তাঁহার উৎকৃষ্ট সমালোচনা পাইয়া আমি বিশেষ পুলকিত হইয়াছিলাম।

কানাইলাল দত্তের মাতুল নন্দলাল দত্ত প্রতিদিন রাত্রে আমার বাড়ীতে আসিয়া বাংলার বৈপ্লবিক কর্ম্মের গল্প করিতেন। এই রাত্রে আসিয়া দিল্লীর বোমা-বিস্ফোরণের সংবাদ তিনি আনন্দের সহিত পরিবেশন করিলেন। দিল্লীতে বিপ্লবীরা কিরূপ দক্ষতার সহিত এই বোমা নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহার জন্য তাহাদের প্রশংসায় তাঁহার কণ্ঠ মুখরিত হইল। তিনি সেদিনও জানিতেন না যে, ভারতের সর্ব্বত্র বৈপ্লবিক কাণ্ডের অনুষ্ঠান তখন কোন্ পটভূমি হইতে সূচিত হইতেছে। তিনি সংবাদপত্র হস্তে যখন আমাদের নিকট উপস্থিত হন, তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই একাধিক ঘটনার আয়োজন যে আমাদেরই করিতে হয়, এ কথা তাঁহার নিকট স্বভাবতঃই গোপন রাখা হইত। আমরা তাঁহার মুখে বৈপ্লবিক ঘটনার বর্ণনা উৎসাহের সহিত শ্রবণ করিতাম। কিন্তু পরে একদিন তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতের বৈপ্লবিক ঘটনার কেন্দ্র-ভূমি চন্দননগর। এই বাড়ী হইতেই তাহার সূচনা হইয়া হইয়া থাকে। নন্দলাল বাবু রাত্রির অর্দ্ধেক ভাগ আমার বাড়ীতে অতিবাহিত করার ফলেই তিনি ইহা ক্রমশঃ বিদিত হন। বিপ্লবের কর্ম্ম তখন পুরা দমেই এখানে চলিয়াছে। রাসবিহারী যথাসময়ে ফিরিল। বসন্তকে সে দিল্লীতেই রাখিয়া আসিয়াছে। আমরা তাহার মুখ হইতে দিল্লীর বোমা-বিস্ফোরণের সমস্ত ব্যাপার শুনিলাম। বোমা ফাটিয়াছে, কিন্তু বড়লাটের জীবন রক্ষা পাইয়াছে। উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়ায়, বিপ্লবিগণ কিঞ্চিৎ মর্ম্মাহত হইল।

বিভিন্ন ঘটনা

আমাদের নির্ম্মিত বোমায় যোগেন্দ্রনাথের প্রাণহানি হওয়ায়, আরও ভাল করিয়া বোমার পরীক্ষা হেতু পরবর্ত্তী মাসেই রাণীগঞ্জ পুলিস ষ্টেশনে এইরূপ আর একটী বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। ইহা পরীক্ষার জন্যই ব্যবহৃত

হইয়াছিল, কোনরূপ প্রাণহানি করার ইচ্ছা ইহার পিছনে ছিল না। বারুদের ক্যাপে কয়েক ফোঁটা ফসফরাস-প্রয়োগের অভাবেই বোমাটী বিদীর্ণ হয় নাই। তারপর সেই এপ্রিল মাসেই চন্দননগরের উপকণ্ঠে ভদ্রেশ্বর থানায় একটী বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। সে বোমাটীও বিদীর্ণ না হওয়ায়, কোন ব্যক্তির প্রাণহানির কারণ হয় নাই, যদিও সে সময়ে দুইজন পুলিস কর্ম্মচারী ঐ স্থানে কর্ম্মরত ছিলেন। অনেকে মনে করেন যে, এই কর্ম্মচারিদ্বয় গোয়েন্দা-বিভাগের সংশ্রবে ছিলেন না। কিন্তু আমরা সংবাদ পাইয়াছিলাম যে, বিপ্লবীদের কর্ম্মে ইহারা হস্তক্ষেপ করিতে কসুর করেন নাই। যাহা হউক, বোমাটী বিস্ফূরিত না হওয়ায়, তাঁহারা সেই যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিলেন।

এই বৎসরে অর্থাভাবপ্রযুক্ত বিপ্লবের কাজ কিছুটা শিথিল হওয়ার উপক্রম হয়। বাংলার বিপ্লবিগণ ডাকাতি করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে বাধ্য হয়। কেননা, সম্পত্তিশালী যাঁহারা বিপ্লব-কর্ম্মে সহায়তা করিতেন, তাঁহারা বাংলার বিপ্লব যতই প্রাণবন্ত হইতে থাকে, ততই কিন্তু একে-একে হাত গুটাইয়া লন। একমাত্র উত্তরপাড়ার মিছরীবাবু শেষ পর্য্যন্ত কিছু-কিছু অর্থ সাহায্য করিতেন। এই অর্থে বাংলার বিপুল বিপ্লব-কর্ম্ম সুসম্পাদিত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। কাজেই ডাকাতিই হইল অর্থ-সংগ্রহের একমাত্র পন্থা।

মাঘ মাসে ঢাকার বরাকর ডাকাতির সংবাদে সংবাদ-পত্র-পাঠকদের উত্তেজিত হইতে দেখিয়াছি। এই ডাকাতি বিনা বাধায় হয় নাই। গ্রামবাসীরা সমবেত হইয়া বিপ্লবীদের কর্ম্মে বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল। এই জন্য বিপ্লবীদের গুলী চালাইতে হয়। একজন গ্রামবাসী ইহার ফলে নিহত হয়। এই ঘটনার পর বিপ্লবিগণ স্থির করেন যে, তাঁহাদের অর্থসঞ্চয়ের পথে প্রতিবাদিরূপে যাঁহারা আগাইবেন, তাঁহাদের হত্যা করাই প্রশস্ত হইবে। অতঃপর প্রত্যেক ডাকাতিতে অবাধ নরহত্যার

সংবাদ আমাদের কাণে আসিয়া পৌঁছিত। দেশের কাজে দেশের সম্পত্তিশালী লোকেদের অর্থ-লুণ্ঠনই আমাদের মনে ক্লেশের কারণ হইয়াছিল। তদুপরি এইরূপ ক্ষেত্রে নিরীহ জনপদবাসীর মৃত্যু-সংবাদে নেতৃগণের মনে তাহা আরও গভীর মর্ম্মপীড়াকর হইয়াছিল। অর্থের অনিবার্য্য প্রয়োজন-হেতু ডাকাতি করার প্রস্তাব গৃহীত হইলেও, পরে সাধ্যপক্ষে নরহত্যা নিবারিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ময়মনসিং জিলার ধুলদিয়া গ্রামে ডাকাতি করিতে গিয়া একজন ভৃত্য দস্যুদলের আগমন-সংবাদ মনিবের নিকট প্রকাশ করায়, তাহাকে নিহত করা হয়। তাহার পর হইতেই এইরূপ হত্যার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা নেতৃগণই প্রদান করেন। অর্থের অভাবে ডাকাতি করার অনুমতি থাকিলেও, এইরূপ নৃশংস হত্যা নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

শুধু নরহত্যা নহে, দুই-একটা ক্ষেত্রে বিপ্লবীরা কুলললনাদের গাত্র হইতে অলঙ্কারাদি কাড়িয়া লইয়াছে, এরূপ সংবাদও আমাদের কাণে পৌঁছে। চন্দননগরের বিপ্লবী পশুপতি ওরফে জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ এইরূপ একটি ডাকাতিতে যোগদান করিয়া আমাদের জানায় যে, অনেক ক্ষেত্রেই নারীরা স্বেচ্ছায় অঙ্গ হইতে অলঙ্কার খুলিয়া দেন। যেখানে ইহার বিপরীত ঘটে, সেখানে রমণীদের গাত্র হইতে অলঙ্কারাদি কাড়িয়া লওয়া হয়। তাহার মুখে আরও শুনিয়াছি—মেয়েদের কাণের মাকড়িও ছিনাইয়া লইতে গিয়া তাঁহাদের কর্ণ রুধিরাক্ত হইয়াছে। এই সকল সংবাদ-প্রাপ্তির পর বিপ্লবনায়কগণ চরিত্রবান্ এবং দায়িত্বশীল তরুণদেরই ডাকাতির কাজে নিযুক্ত করিতেন। অনেক ডাকাতিতেই পর্য্যবেক্ষকরূপে চন্দননগরের জ্যোতিষচন্দ্র উপস্থিত থাকিত। বিপ্লবীদের কাজে প্রতি বৎসর ৫০ হাজার টাকা ব্যয়িত হইত। এই টাকা সংগ্রহ করা লুণ্ঠন ব্যতীত অন্য উপায়ে হওয়া সেদিন সম্ভবপর ছিল না।

বীর বসন্তের ফাঁসী

বসন্তকুমার দিল্লীতে বাস করিতেছিল। মধ্যে-মধ্যে দেরাদুনে রাসবিহারীর কর্ম্মস্থানে গিয়া সে বৈপ্লবিক কর্ম্মের পরামর্শ করিয়া আসিত। এইরূপে এক পরামর্শেই স্থির হয় যে, লাহোরের রাজপুরুষগণ যখন লরেন্স গার্ডেনে প্রবেশ করিবেন, সেই সময়ে বসন্তকুমার একটী বোমা সেই প্রবেশ-পথে রক্ষা করিবে। তদনুযায়ী ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মে লরেন্স গার্ডেনের গেটে বোমা সংরক্ষিত হয়। লাহোরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের গাড়ী এই ফটকে প্রবেশ করার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই একটী চাপরাসী আসিয়া জুতা দিয়া বোমাটীকে আঘাত করে। তাহার ফলে বোমাটী সশব্দে বিদীর্ণ হয় এবং চাপরাসীটী বোমার আঘাতে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অদূরেই বসন্তকুমার পদচারণা করিতেছিল এবং পূর্ব্ব হইতেই একজন বাঙ্গালী বিপ্লবীর আগমন-সংবাদ পুলিসের কাণে পৌঁছিয়াছিল। বসন্তকুমারকে এতদবস্থায় অবস্থান করিতে দেখিয়া পুলিস কর্ত্তৃক সে ধৃত হয় এবং সেই ব্যক্তিই যে লর্ড হার্ডিঞ্জকে হত্যার প্রচেষ্টায় বোমা ছুঁড়িয়াছিল এবং লরেন্স গার্ডেনেও সেই যে বোমা রাখিয়াছিল, ইহা প্রমাণিত করিয়া তাহাকে হত্যাপরাধে ফাঁসী দেওয়া হয়। সেই নির্ভীক বাঙ্গালী তরুণের মুখে পুলিসের শত অত্যাচারেও একটী বাণীও উচ্চারিত হয় নাই। তাহা যদি হইত, অমরেন্দ্রনাথ ও আমি যুগপৎ বন্দী হইতাম। কিন্তু বসন্তকুমার আমীরচাঁদের গৃহে বাস করিত। এইজন্য আমীরচাঁদের উপর পুলিসের কড়া দৃষ্টি পড়িয়াছিল। আর রাসবিহারী বসন্তকুমার ধৃত হইয়াছে শুনিয়াই দীর্ঘ ছুটি লইয়া চন্দননগরে চলিয়া আসিল।

লাট্টু বা শচীন সান্ন্যাল

প্রায় প্রতি রবিবারেই অমৃতলাল ওরফে শশাঙ্ক আমার নিকট আসিত। রবিবারে আমি একটি ক্লাস লইতাম, বহু তরুণ এই ক্লাসে

যোগদান করিত। এই ক্লাস হইতেই বিপ্লবীদের বাছাই হইত। ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া একদল সর্ব্বহারাই ভারতের স্বাধীনতা আনিবে—এই কথাই গীতা-উপনিষদের ব্যাখ্যার সহিত আমি জোর করিয়া বলিতাম। অমৃতলাল নিয়মিত আমার ক্লাসে যোগদান করিয়া তাহার অধ্যাত্ম-পিপাসা চরিতার্থ করিত। প্রধানতঃ শ্রীঅরবিন্দের আত্মসমর্পণ-যোগের কথাই আমি উন্মাদের ন্যায় বলিতাম। আমার কথায় ছাত্রগণের সহিত অমৃতলালও উদ্বুদ্ধ হইত।

একদিন সে একটি তরুণকে লইয়া আমার সহিত পরিচয় করাইয়া দিল। তরুণের নাম আজ আর কাহারও অবিদিত নাই। শচীন্দ্রনাথ সান্যালের নাম বিপ্লব-যুগের ইতিহাসে অমর হইয়াই থাকিবে। রাসবিহারী তাহার কর্ম্মচাতুর্য্যে বিশেষভাবে পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে "লাট্টু" নামে অভিহিত করিত। এমন দুঃসাহসিক কর্ম্ম কিছু ছিল না, যাহা শচীন্দ্রনাথ সিদ্ধ করিতে না আগাইত। শচীন্দ্রনাথ আমার নিকট হইতে একটি রিভলভার প্রার্থনা করিল। এই ভার ছিল অমৃতলালের উপর। আমারই নির্দ্দেশে শচীন্দ্রনাথ একটি রিভলভার পাইল এবং অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইয়া সে বিপ্লবের কর্ম্মে অবহিত হইল। এই শচীন্দ্রনাথই সুসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে "পথের দাবী" লিখাইবার প্রেরণা যোগাইয়াছিল। শচীন্দ্র-নাথের পরবর্ত্তী বীর-কীর্ত্তির কথা পরে আরও বলিব।

বর্দ্ধমানের বন্যা ও মাখনলাল

জুন মাসের শেষে দামোদর নদে মহাপ্লাবন ঘটিল। এমন ভীষণ জলপ্লাবনের কথা পুর্ব্বে শুনি নাই। বহু গ্রাম ভাসিল, বহু গবাদি পশু মরিল। বহু নরনারীও এই প্লাবনে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া খরস্রোতে কত মাঠ যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল, কত মন্দির,

কত জনপদ ভাসিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। বর্দ্ধমান সহরেও নদীর জল তাথিয়া-তাথিয়া নৃত্য করিয়া ফিরিল। কত বাড়ী ভূমিসাৎ হইল। মানুষ আর্ত্ত হইয়া ভাবিল—কবে সহর হইতে জল নিষ্কাশিত হইবে। বর্দ্ধমান সহরের এই দুর্দ্দশা হইতেই গ্রামের অবস্থা অনুমেয়। লক্ষ-লক্ষ নরনারী গৃহহীন হইয়া পথে বসিয়াছিল।

এই সময়ে রাষ্ট্রনেতা ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী অগ্রবর্ত্তী হইয়া অর্থ সংগ্রহ করেন। বসন্তকুমার লাহিড়ী এই কার্য্যে উৎসাহ দিতে বর্দ্ধমান সহরে উপস্থিত হন। তাঁর সঙ্গে আসেন "অনুশীলন সমিতি"র মাখনলাল সেন, বিনোদ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি। এই সময়ে আমিও বর্দ্ধমান সহরে আমার এক আত্মীয়ের সংবাদ লইতে উপস্থিত হই এবং বর্দ্ধমান ষ্টেশনের পার্শ্বেই মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের একটি গৃহে বসিয়া মাখনলালকে যোগ্যতার সহিত আর্ত্তসেবার কাজে স্বেচ্ছাসেবকগণকে নির্দ্দেশ দিতে দেখি। মাখনবাবুর সহিত আমার পূর্ব্বেই পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহার সহযোগী হইয়া তাঁহার কাজে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করিলাম। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই নিদারুণ উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইয়া আমায় চন্দননগরে ফিরিয়া আসিতে হয়। তাহার পর সুস্থ হইয়া, এই লোক-সেবার কাজে আমি আবার আত্মনিয়োগ করি।

মাখনবাবু সেবাকর্ম্মে অত্যন্ত নিপুণ। ম্যাপ্ দেখিয়া তিনি বন্যা-পীড়িত স্থানে অর্থ ও রসদ স্বেচ্ছাসেবকগণ দিয়া প্রেরণ করেন। দেশের সর্ব্বক্ষেত্র হইতে অর্থসাহায্য আসিতে থাকে। দুই-এক হাজার টাকা মণি-অর্ডার-যোগে প্রত্যহ এই সেবাকেন্দ্রে প্রেরিত হয়। তার উপর বসন্ত-কুমার লাহিড়ী মহাশয় প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনেন। মাখনবাবু যোগ্যতার সহিত এই অর্থ লোকসেবায় অকাতরে ব্যয় করেন। তাঁহার কর্ম্মে এই কার্য্যালয়ে বসিয়া আমি অক্লান্তভাবে সহায়তা করিয়াছিলাম। এই সেবাকর্ম্ম করিতেন যাঁহারা, তাঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন বিপ্লবপন্থী।

বর্দ্ধমানের এই সেবাকেন্দ্রে বসিয়াই বাংলার বিভিন্ন বিপ্লবসমিতিগুলির সহিত সংযুক্ত হওয়ার সুবিধা হইয়াছিল। গোয়েন্দা-পুলিসের এই দিকে সজাগ দৃষ্টি থাকিলেও, যেরূপ অকাতরে স্বেচ্ছাসেবকগণ বন্যাপীড়িতদের সহায়তা করিতেছিল, তাহাতে পুলিস-কর্ম্মচারিবৃন্দ হতভম্ব হইয়া বসিয়া থাকা ব্যতীত বিপ্লবীদের অবাধ মেলামেশায় বাধা সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইত না।

বাঘা যতীনের মর্ম্মগীতি

এই বিপ্লবকেন্দ্রে থাকিয়াই বাঘা যতীন্দ্রনাথের সহিত অন্তর-পরিচয় হয়। সে এক গভীর রাত্রি-কাল। যখন স্বেচ্ছাসেবকরা সকলে তন্দ্রাতুর, তখন আমের বনে রামপ্রসাদী সুরে একজনের কণ্ঠে মাতৃবন্দনার ঝঙ্কার উঠিল। জ্যোৎস্নায় চারিদিক্ ভাসিতেছে। তরুপল্লব জ্যোৎস্নাবিধৌত হইয়া অপরূপ কান্তিতে ঝিক্‌মিক্ করিয়া বাতাসে দোল খাইতেছে। কিছু দূরে রেলগাড়ীর হুস্-হুস্ শব্দ। উদাত্ত কণ্ঠে সঙ্গীতের ঝরণা ঝরিতেছিল। রাত্রি-জাগরণের অভ্যাস আমার ছিল। আকাশের চাঁদ দেখিতে-দেখিতে আমি বিভোর হইতাম। কিন্তু এই কণ্ঠস্বর আমায় যেন আহ্বান করিয়া গায়কের কাছে লইয়া চলিল। আমি ধীরে-ধীরে গায়কের নিকটস্থ হইতেই কাণে গেল—"ভায়া যে!" পরিচয় ছিল— এই সেবাকর্ম্মে যতীন্দ্রনাথ বহুবার দল-বল লইয়া আসিতেন এবং কয়েক দিন কেন্দ্র-অফিসে কাল যাপন করিয়া আবার ফিরিতেন। আজ তাঁহার চক্ষে জলধারা ঝরিতেছে। আমি বিস্ময়বিহ্বল নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিতেই যতীন্দ্রনাথ আমায় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "দাদা, আমার গাঁজা কি ভিজিবে না?" সে মধুর কণ্ঠ আমি আজিও ভুলিতে পারি নাই। দেশমাতৃকার প্রেমে, আনন্দে তাঁহার গাঁজা ভিজিয়াছে, সে প্রমাণ তাঁহার জীবনের ইতিহাসে সুবিদিত। আমি সেদিনও

যতীন্দ্রনাথের সম্যক্ পরিচয় পাই নাই। তিনি যে কোম্পানীর দপ্তরে কর্ম্ম করিতেন, শ্রীঅরবিন্দের অনুগত তিনিও যে একজন দেশব্রতী, সামসুল আলমের হত্যাকারী ধৃত ব্যক্তির তিনি যে নেতৃস্বরূপ, সে সকল কথা সেদিন জানিতাম না। তাঁহার হৃদয়ের স্পর্শ পাইয়া আমি স্বাধীনতা-বহ্নির আস্বাদ অনুভব করিলাম। যতীন্দ্রনাথের সহিত আমার এই অন্তর-মিলনের মধুর দিনটি চিরদিনের জন্য আমার চিত্তপটে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

আম্রকাননে বসিয়া দুইজনে কত কথা হইল! শ্রীঅরবিন্দের বিদায়-যুগের বর্ণনা তিনি কাণ পাতিয়া শুনিলেন। শ্রীঅরবিন্দের নির্দ্দেশ প্রত্যক্ষ-ভাবে চন্দননগর মারফৎ আসে; কিন্তু প্রকৃত লোকটির সহিত পরিচয় করার কত আগ্রহ যে তাঁহার বুকে ছিল, সেই সকল বিষয় প্রকাশ করিতে-করিতে তিনি অনর্গল কথা বলিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রেম-বিহ্বল আঁখি দুইটি পুনঃ-পুনঃ জলে ভরিল। পুনঃ-পুনঃ প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি দেশমাতৃকার মুক্তিপথের কথাই শুনাইলেন। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসে। দুইজনে আবেগকম্পিত হৃদয় লইয়া স্ব-স্ব আড্ডায় আসিয়া বিশ্রাম করিলাম। তার দুই দিন পরে অমরেন্দ্রনাথ মাখনলালের সহিত পরামর্শ করিয়া, বর্দ্ধমানের সেবাকার্য্যের সকল দায়িত্ব আমার কাঁধে চাপাইয়া, দুইজনে কাঁথির সাহায্য-কেন্দ্রে প্রস্থান করিলেন। মিউনিসিপ্যাল স্কুলটিতে দীর্ঘদিন কর্ম্ম পরিচালনা অসম্ভব বুঝিয়া, আমরা মিউনিসিপ্যাল হলে উঠিয়া আসিলাম। দীঘীর পাড়ে এই প্রশস্ত অট্টালিকায় কেন্দ্র-কার্য্যালয় স্থাপন করিয়া, প্রায় মাসাধিক কর্ম্ম-পরিচালনার পর আমি দারুণ ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হই। অমৃতলাল আসিয়া আমার এইরূপ অবস্থিতি আর সঙ্গত নহে, ইহা মনে করিয়া একপ্রকার বলপূর্ব্বক আমাকে চন্দননগরে টানিয়া লইয়া আসিল। বর্দ্ধমানে অবস্থানকালে সেবাকর্ম্মের আশ্রয়ে বাংলার প্রসিদ্ধ

বিপ্লব-সঙ্ঘগুলির মধ্যে মিলনসূত্র অধিকতর দৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করা হইয়াছিল। অন্যান্য বিপ্লবসমিতির সহিত পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইল। "চন্দননগর"ও "অনুশীলন সমিতির" সহিত অধিকতরভাবে একাত্ম হইয়া কার্য্যনির্বাহ করিতে লাগিল।

সন্ত্রাসবাদ ও বিপ্লবপ্রেরণা

এই সময়ে রাসবিহারী, শ্রীশচন্দ্র, প্রতুলচন্দ্র প্রভৃতির মিলিত এক বিপ্লব-সভায় স্থির হয় যে, বিপ্লবীদের প্রত্যেককেই স্বদেশসেবার পরাকাষ্ঠা-রূপে কোন-না-কোন "পি-এম্" অর্থাৎ রাজনৈতিক হত্যা করিতেই হইবে, নতুবা বিপ্লবকর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করার অধিকার কাহাকেও দেওয়া হইবে না। প্রতুলচন্দ্র এই কর্ম্মে অগ্রণী হইল। সংবাদপত্রে বাহির হইল যে, ২৭শে সেপ্টেম্বর জনবহুল কলেজ স্কোয়ারে জলপথের ঘাটে দাঁড়াইয়া পুলিস ইন্সপেক্টর হরিপদ দেব যখন বায়ুসেবন করিতেছিলেন, কে বা কাহারা তাঁহাকে গুলীর আঘাতে নিহত করিয়াছে। সংবাদের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হইল না। তার কয়েক দিন পরেই পুলিসের বড়কর্ত্তা বঙ্কিম চৌধুরীর উপর বোমাক্ষেপে হত্যার বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুর, ঢাকা ও ময়মনসিংহে রাষ্ট্রীয় দস্যুবৃত্তির সংবাদে সংবাদপত্র পূর্ণ হইতে লাগিল। ফরিদপুরের কাওয়াকুড়ি, ঢাকার টঙ্গীবাড়ী ও ত্রিপুরার খরোমপুর, কুমিল্লার পশ্চিমসিংহ, এবং ময়মনসিংহের ধুলদিয়া, কেদারপুর ও সারাচরের ডাকাতি উল্লেখযোগ্য। চন্দননগর সর্ব্ববিধ বিপ্লবকর্ম্মে সহায়তা করিতেছিল। স্বাধীনতাই ছিল আমাদের লক্ষ্য। বিদেশী রাষ্ট্রশক্তিকে অকর্ম্মণ্য করার সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি করাই ছিল আমাদের বর্ত্তমান কর্ম্মনীতি। এই কর্ম্মের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিত "অনুশীলন সমিতি"। পশ্চিমবঙ্গের

বিপ্লবকেন্দ্রও ধীরে-ধীরে অর্থসংগ্রহের জন্য এই পথই আশ্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ২৪পরগণার ছত্রবাড়ী ডাকাতি কলিকাতার বিপ্লব-সংহতি কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। "অনুশীলন সমিতির" শাখাকেন্দ্রে পূর্ব্ববঙ্গ ছাইয়া গিয়াছিল। চট্টলের বিপ্লবপ্রচেষ্টা এই যুগে পরিলক্ষিত হয় নাই। জননেতা যাত্রামোহন সেনের নেতৃত্বে চট্টলবাসী এই সময়ে নিয়মতান্ত্রিক পথেই রাষ্ট্র-স্বাধীনতার প্রয়াস করিতেছিল। ত্রিপুরা, ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানেই বিপ্লবকেন্দ্র দৃঢ় প্রতিষ্ঠা পাইয়াছিল।

যখন বাংলার বিপ্লব মাথা তুলিয়া ইংরাজ-শাসনের গোড়া উপড়াইয়া দিবার উপক্রম করিতেছে, সেই সময়ে রাসবিহারী আসিয়া আমায় একদিন বলিল "এই সময়ে কর্ত্তার নিকট হইতে তাঁহার আশীর্ব্বাদ লইয়া আসিতে হইবে। খুন-ডাকাতি করিয়া দীর্ঘ দিন কাটাইয়া আমরা ক্রমেই খুনীর দলে পড়িব। দেশব্যাপী বিপ্লব সৃষ্টি করিয়া ভারত হইতে ইংরাজকে বিতাড়িত করিতে হইবে। তুমি শীঘ্র শ্রীঅরবিন্দের আশীর্ব্বাদ লইয়া এস।"

বর্দ্ধমান সেবাকেন্দ্র হইতে ফিরিলে, পুলিসের কড়া নজর আমার উপর আরও কড়া হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি একদিন প্রাতর্ভ্রমণকালে চন্দননগরের সীমা অসতর্কভাবে অতিক্রম করায়, একদল প্রহরারত পুলিসকে আমার দিকে আগাইয়া আসিতে দেখি। পরে শুনিয়াছি যে, ইংরাজাধিকৃত স্থানে আমাকে পাইলে, পুলিস ধৃত করিবে। ফরাসী গভর্ণমেণ্ট ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের বার-বার অনুরোধ-সত্ত্বেও আমার বিরুদ্ধে "এক্সট্রাডিশান ওয়ারেণ্ট" জাহির করেন নাই। পুলিসের আচরণ দেখিয়াই বুঝিলাম যে, আমার চন্দননগরের বাহিরে যাওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। রাসবিহারী বলিল "এবার তোমায় আত্মগোপন করিয়া পণ্ডিচেরী যাইতে হইবে এবং এই সংবাদ কর্ত্তাকে দিয়া বিপ্লব করার

অনুমতিটুকু তোমায় লইয়া আসিতে হইবে। আমি তাহার ব্যবস্থা করিব।" রাসবিহারীর কথামত পণ্ডিচারী-গমনে আমি স্বীকৃত হইলাম। এক রাত্রে সাগরকালী ঘোষ আমায় কাঁকিনাড়া ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল। আমি তথায় গিয়া দমদম ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম। গেটের বাহির হইয়া দেখি, রাসবিহারী সুদর্শন চট্টোপাধ্যায়কে লইয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আমরা মোটরযোগে রাজাবাজারে অমৃতলাল হাজরার বাসায় গিয়া উঠিলাম। তার পরদিন প্রাতঃকালে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে সুদর্শনের ত্রিতল বাসায় পৌঁছিলাম। রাসবিহারী ইতোমধ্যে সাহেবী পোষাক খরিদ করিয়া রাখিয়াছিল। আমায় উহা পরাইয়া সে বলিল, "বাঃ, বেশ দেখাইতেছে! তোমাকে কে বলিবে বাঙালী, খাস্ ইংরাজ বলিয়া সকলেই মনে করিবে।"

আমি সাহেবের বেশে একখানি ইউরোপীয়ান মধ্যম শ্রেণীর ট্রেণ-কামরায় চাপিয়া বসিলাম। রাসবিহারী আমায় তুলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। সুদর্শন আমার খানসামা সাজিয়া আমার সঙ্গে গাড়ীতে উঠিল।

তিন মাস পণ্ডিচেরীবাসের পরে আর সাহেবের বেশে ফিরিতে ইচ্ছা হইল না। শ্রীঅরবিন্দের নির্দ্দেশক্রমেই "দুপ্লে" জাহাজে চড়িয়া সমুদ্রবক্ষে পাড়ি দিলাম। কলিকাতায় আসিয়া একবার ইচ্ছা হইল যে, রাজাবাজারের বাসায় রাত্রি যাপন করিয়া যাই। তারপরই মনে হইল যে, না, সোজাসুজি চন্দননগরেই ফিরিয়া যাইব। রাত্রি অধিক হইয়াছিল, তবুও ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বুকষ্টলে বড়-বড় অক্ষরে সংবাদের শিরোনামা দেখি—"রাজাবাজার বোমার কারখানা খানাতল্লাসী ও অমৃতলাল হাজরা ওরফে শশাঙ্ক হাজরার গ্রেপ্তার।" অন্তর্দ্দেবতার অনুপ্রেরণার মধ্যে অজ্ঞাত বিপৎপাত হইতে নিস্তারেরই সঙ্কেত ছিল। ইহা পরে উপলব্ধি করিয়া শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্মদান-বোধে তাঁহার প্রতি আমার হৃদয় শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল।

সাহেবদের জন্য একখানি থিয়েটার-ট্রেণ প্রস্তুত ছিল, তাহাতেই আমি উঠিয়া বসিলাম। গভীর রাত্রে চন্দননগরে ফিরিলাম।

পথের সহায়তা ও বাধা

বাংলার বিপ্লব-প্রেরণা ক্রমেই প্রবলতর হইল। ডাকাতির হিড়িক চলিলেও, কলিকাতার বিপ্লবপন্থীরা যত শীঘ্র সম্ভবপর বিপ্লব সৃষ্টি করার আয়োজনের জন্য বিশেষভাবে উদ্যত হইল। আমি পণ্ডিচারী হইতে ফিরিয়াই দেখি যে, রাসবিহারী দেরাদুন হইতে চিরদিনের মত বাসস্থান গুটাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সে ছদ্মবেশেই বাস করে। দিনের বেলায় স্বতন্ত্র স্থানে সে আত্মগোপন করিয়া থাকে। রাত্রি হইলে, আমার বাড়ী এই যুগে বিপ্লবীদের মিলন-কেন্দ্র-রূপে পরিণত হওয়ায়, অনেকের সহিত সাক্ষাৎকার করার ও বিপ্লবের পরামর্শের জন্য সেও এখানে যোগদান করিতে আসে।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবে হরদয়াল নামে এক পাঞ্জাবী যুবক রাষ্ট্র-সাহায্যে বিলাতে অধ্যয়ন করিতে যান; কিন্তু সেইখানে তাঁহার মতি-গতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হওয়ায়, ভারত হইতে ইংরাজ-বিতাড়নের উদ্দেশ্যে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবে তিনি পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং পাঞ্জাবের একদল যুবক লইয়া ভারতে বিপ্লব-সাধনের প্রয়াস কেমন করিয়া সার্থক করা যায়, তাহার চেষ্টা করিতে থাকেন। তাঁহার লিখিত অনেক বৈপ্লবিক প্রবন্ধ আমাদের হস্তগত হইত। এই সময়ে বাংলা হইতে 'স্বাধীন ভারত' নামে বিপ্লবী দলের একখানি পত্রিকা বাহির হইত। "অনুশীলন সমিতি"র অনুরোধে আমিও "স্বাধীন ভারতে" লিখিতাম। অমৃতলাল এই সকল কাগজপত্র ভারতে যে সকল ক্ষেত্রে বাঙালী বিপ্লবীরা অবস্থান করিত, সেখানে তাহাদের পাঠাইয়া দিত। "লিবার্টী" নামে একখানি ইংরাজী পত্রিকাও এই সময়ে বাহির হইত।

সেই স্থত্র ধরিয়াই দিল্লীর বোমা-বিস্ফোরণের পর হরদয়ালের সহিত রাসবিহারীর পরিচয় দৃঢ় হয় এবং হরদয়ালের বন্ধু চ্যাটার্জ্জী ও দীননাথের সহিতও তাহার আলাপ হয়। এই আলাপের ফলেই হরদয়ালের সহিত রাসবিহারীর দলেরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঘটে। হরদয়ালের প্রতিষ্ঠিত "গধর পার্টি" পরে ভারতে বিপ্লবানয়নের যে প্রচেষ্টা করিয়াছিল, সে কথা এখানে নহে।

দিল্লীর বোমাবিস্ফোরণের পর মে বা জুন মাসে লাহোর লরেন্স গার্ডেনে যে বোমাটী বিদীর্ণ হয়, সেই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া দীননাথ পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হয়। তারপর দীননাথ রাজসাক্ষী হইয়া বিপ্লবীদের বিবরণ প্রদান করে। বসন্তকুমার, আমীরচাঁদ, আউধবিহারী, বালমুকুন্দ ধৃত হইলেই রাসবিহারী দেরাদুনের ফরেষ্ট অফিসের বড়বাবুর কাজে ইস্তফা দিয়া চন্দননগরে পলাইয়া আসে। দিল্লীর ষড়যন্ত্রে বিপ্লবের কাজে উপরোক্ত চারি ব্যক্তি নিয়োজিত থাকার অভিযোগে তাঁহাদের ফাঁসী হয়। হরদয়াল তখন বিদেশে, তাই ইংরাজ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই। এই দীননাথের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে পাঞ্জাবের বিপ্লব-প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। এদিকে অমৃতলাল হাজরা এবং "অনুশীলন সমিতির" আরও বহু কর্ম্মী বন্দী হওয়ায়, গিরিজাবাবু ওরফে নগেন্দ্রনাথ দত্তই তখন পাঞ্জাবের সহিত বাংলার যোগ রক্ষা করিতে থাকেন। গিরিজাবাবু দীর্ঘদিন রাসবিহারীর সহিত কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে কানাইলালের বীরত্বপূর্ণ কর্ম্মে শুধু বাংলাই নহে, বাংলার বাহিরেও বাঙালী তরুণেরা অতিশয় উৎসাহ লাভ করিয়াছিল। ইহার পর হইতেই শচীন্দ্রনাথ সান্যাল কাশীর বাঙ্গালীটোলার তরুণদের লইয়া এক সংস্থা রচনা করে। যদিও এ সংস্থার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ছিল চরিত্রগঠন ও ব্যায়ামচর্চ্চা, কিন্তু শচীন্দ্রনাথ এই দলে বিপ্লবী বাংলার আলোচনায় লিপ্ত থাকিত। "অনুশীলন-সমিতির" প্রতি অনুরাগবশতঃ

এই দলের নাম "অনুশীলন সমিতি" রাখায়, অমৃতলাল শচীন্দ্রনাথকে যথারীতি "স্বাধীন ভারত" পাঠাইয়া দিত। পরে "অনুশীলন-সমিতি" গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইলে, শচীন্দ্রনাথ সমিতির নাম পরিবর্ত্তন করে। অমৃতলাল হাজরা বন্দী হইয়া আন্দামানে প্রেরিত হইলে, এই দলের মধ্যে যাহাদের বিপ্লবী হওয়ার যোগ্য মনে হইয়াছিল, তাহাদের হইয়া শচীন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র দল গঠন করে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের শেষ-ভাগে রাসবিহারী শচীন্দ্রনাথের আশ্রয়েই দীর্ঘদিন বাস করার সুযোগ পাইয়াছিল।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের গোড়া হইতেই দেশব্যাপী বিপ্লব সৃষ্টি করিয়া ইংরাজ রাজ্যের অবসান আনার জন্য বিপ্লবীরা প্রস্তুত হইতেছিল; এই জন্য "অনুশীলন-সমিতি" চট্টগ্রামে গিয়াও দল বাঁধিয়াছিল। সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানগুলি বিপ্লবীদের অধিকারে না থাকিলে, দেশব্যাপী বিদ্রোহের সৃষ্টি সম্ভবপর নহে বলিয়া চট্টলেও "অনুশীলন সমিতি" অভিযান করে। দুঃখের বিষয়, আলিপুর বোমার মামলায় নরেন্দ্রনাথ নির্ম্মমভাবে নিহত হইলেও, সমিতির মধ্যে দুর্ব্বলচিত্ত তরুণের অভাব হয় নাই। পাঞ্জাবের দীননাথের ন্যায় তরুণেরা কেহ-কেহ কার্য্যকালে রাজসাক্ষী হইত, অন্যেরা সমিতির মধ্যে গুপ্তচরের কার্য্য করিত। চট্টলেও সমিতি গড়ার সঙ্গে-সঙ্গে গুপ্তচর জুটিল। যদিও তাহার সন্ধান পাওয়া মাত্র তাহাকে হত্যা করা হইয়াছিল; কিন্তু বিপ্লবকর্ম্মে দেশের এই গলদ চিরদিনই রহিয়া গিয়াছিল। বিভীষণের জাতি পররাষ্ট্র হইতে দেশের মুক্তি-সাধনের পথে কিরূপ অন্তরায় হইয়াছিল, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত। বাংলায় যে ৯টী প্রসিদ্ধ বিপ্লব-কেন্দ্র ছিল, তাহাদের প্রত্যেকটীর মধ্যেই জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে পুলিসকে খবর দিবার লোক থাকিত। চট্টলের সত্যেন্দ্রনাথ সেন গুপ্তচর বলিয়া অবগত হওয়া মাত্রই তাহাকে হত্যা করা হয়। কিন্তু এই দুষ্কৃতির প্রবাহ শেষ দিন পর্য্যন্ত রুদ্ধ হয় নাই। গুপ্তচরবৃত্তি

অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার সিদ্ধান্ত বিপ্লবনেতৃগণের থাকিলেও এবং তাহা যথারীতি কার্য্যকরী করার প্রচেষ্টা হইলেও, কোন বিপ্লবী সঙ্ঘ সম্পূর্ণভাবে এই দোষমুক্ত হইতে পারে নাই।

সমিতির বিশ্বাসার্জ্জনের জন্য অনেক সময়ে এই সকল গুপ্তচরেরাই সাহসিকতার পরিচয় অধিক করিয়া দিত। ঢাকায় গোয়েন্দা পুলিস বসন্তবাবুকে খবর দেওয়ায়, এইরূপ একজন গুপ্তচর রামদাসকে সদর রাস্তার উপর নিহত করা হয়। কিন্তু এত করিয়াও গুপ্তচরদের চৈতন্যোদয় হয় নাই।

মহাযুদ্ধের সুযোগ ও অস্ত্রসংগ্রহ

ভারতব্যাপী বিপ্লবের প্রয়াসে এই সময়ে বাংলার সর্ব্বত্র বিপ্লব-কেন্দ্র সংস্থাপিত হইয়াছে। বাংলার বাহিরেও সুদূর ব্রহ্মদেশ হইতে পাঞ্জাব, উড়িষ্যা, মধ্য প্রদেশ, মাদ্রাজ ও বোম্বাইএর উপকূল—সর্ব্বত্র এই আন্দোলন ছড়াইয়া পড়ে। এই সময়ে ধূনার গন্ধে মনসার নাচনের ন্যায় ইউরোপে মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল। ইহাই "প্রথম বিশ্বযুদ্ধ" নামে ইতিহাসে প্রখ্যাত।

সার্ভিয়ার ঘটনা উপলক্ষ করিয়া অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মাণী ইউরোপে রণডঙ্কা বাজাইলেন। সার্ভিয়াকে রক্ষা করিতে ফরাসী, বৃটেন প্রভৃতি রাষ্ট্রশক্তি তুমুল সংগ্রামে নামিল। এই সুযোগ বাংলার বিপ্লবীরা ছাড়িল না। ইউরোপের এই প্রথম মহাযুদ্ধে কাইজারের সহায়তা পাওয়ার প্রত্যাশায় আমরা বিস্তৃত আয়োজন করিলাম। আমেরিকায়, চীনে, ব্যাটেভিয়ায় যে সকল বিপ্লবী ছিলেন, তাঁহারা ভারতের স্বাধীনতা আনিবার জন্য এই সময়ে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কলিকাতার বিপ্লবী বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলী, অনুকূল মুখার্জ্জী প্রভৃতি বিশেষভাবে অস্ত্র-সংগ্রহে মন দিলেন। তাঁহাদের এক কর্ম্মী শ্রীশচন্দ্র সরকার রডা কোম্পানীর অফিসে

কর্ম্ম করিত। ২৬শে আগষ্ট বুধবার এই কর্ম্মীকে দিয়া কাষ্টম্‌স অফিস হইতে ২০২ কেসে যে মজার পিস্তল ও প্রচুর টোটা আসে, তাহার মধ্যে ১৭২টী কেস্‌ কোম্পানীর অফিসে রাখিয়া বাকী ৩০টি কেস্‌ সরাইবার ব্যবস্থা করা হয়। ৫০টী মজার পিস্তল অন্তর্হিত হয়। তন্মধ্যে ৬টী পিস্তল সম্ভবতঃ বিপিন গাঙ্গুলী ও অনুকূল মুখার্জ্জী রাখেন; অবশিষ্ট ৪৪টী পিস্তল ৯টী বিপ্লবী দলের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া হয়। এই সময়ে এইটুকু অস্ত্রবলও বিপ্লবী বাঙ্গালীদের কিরূপ সহায়তা করিয়াছিল, তাহা পরবর্ত্তী বাংলা-ব্যাপী ডাকাতি ও বিপ্লব-বিরোধিগণের হত্যাকাণ্ডে প্রমাণিত হয়। দুঃখের বিষয়, ৩১টী মজার পিস্তল পুলিস পরে হস্তগত করে। তৎপরে সুশীলকুমার সেন কয়েকটী মজার পিস্তল গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করে। বাকী পিস্তলগুলির সন্ধান দিবার জন্য পরবর্ত্তী যুগে টেগার্ট সাহেব আমাকে খুব পীড়াপীড়ি করেন, কিন্তু সে সন্ধান আর তাঁহারা পান নাই।

মজার পিস্তলগুলি বিপ্লবীদের মধ্যে হস্তান্তরিত হইলেও, ইহার সঙ্গে যে ৩০০ জোরের ৪৬০০০ রাউণ্ড কার্ত্তুজ-বাক্স কটন ষ্ট্রীটের এক গুদামে তোলা হয়, তাহা স্থানান্তরিত করার সুযোগ কলিকাতার বিপ্লবীরা করিতে পারেন নাই। এই সময়ে অনুকূলবাবু এই কার্ত্তুজগুলি যাহাতে উদ্ধার করা হয়, তজ্জন্য চন্দননগরে সংবাদ প্রেরণ করেন। কার্ত্তুজগুলি যে গুদামে ছিল, তাহা পূর্ব্ব হইতেই ভাড়া করিয়া রাখা হইয়াছিল। কিন্তু রডা কোম্পানীর বন্দুক চুরি যাওয়ার পর এই কার্ত্তুজগুলি যে কাঠের বাক্সে আসিয়াছিল, তাহার বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। অতএব এরূপ বাক্স গরুর গাড়ী বোঝাই দিয়া প্রকাশ্যে বাহির করার উপায় ছিল না। পাশেই মাড়োয়ারীদের বড়-বড় গদী। দূরে-দূরে পুলিসের প্রহরা। এই অবস্থায় কেহই ভরসা করিয়া কার্ত্তুজ উদ্ধার করিতে আগাইতে পারিতেছিল না। গুদামের চাবীর গোছা রাখিয়া, সংবাদদাতা

প্রস্থান করিল। আমি শ্রীশচন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। দুইজনেই এক প্রকার চন্দননগরে বন্দী অবস্থায় বাস করি। শ্রীশচন্দ্র তবুও গোপন সতর্কতায় মাঝে-মাঝে কলিকাতায় ঘুরিয়া আসে। আমি নজরবন্দী হইয়া বাড়ীতেই থাকি। মোড়ে-মোড়ে পুলিসের কড়া পাহারা। বসন্তকুমারের ফাঁসীর পর রাসবিহারী ছদ্মবেশে পলায়ন করিলে, আমাকে ধৃত করার সমধিক আয়োজন ইংরাজ গোয়েন্দা পুলিস করিয়াছিল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দের নিকট হইতে ফিরিয়াই আমায় বাধ্য হইয়া স্বতন্ত্র সংসার পাতিতে হয়। অতীতের সহিত আমার সকল সম্বন্ধ ঘুচিয়া যাওয়ায়, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র পুলিসের প্ররোচনায় আমার এক প্রকার বিরুদ্ধাচারী হইয়া উঠে। এমন কি একবার তাহার সত্য সহকারিত্ব বুঝিবার জন্য পুলিস তাহাকে আমার একটী ফটো চুরি করার অনুরোধ জানায়। আমার এই প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রটী পুলিসের এই অনুরোধ অনায়াসেই রক্ষা করে। আমার স্ত্রীর সম্মুখেই সে গৃহে প্রবেশ করিয়া, আমার ফটোটী লইয়া ছুটিয়া পালায়। এই অবস্থায় আমার সঙ্কটময় জীবনের কথা সহজেই অনুমেয়। তার উপর ফরাসী রাজ্য বলিয়া প্রকাশ্যে আমায় ধৃত করার পুরস্কার ঘোষণা না করিলেও, আমার গতিবিধি পুলিস ব্যতীত এই ভ্রাতুষ্পুত্র এবং কয়েক জন প্রতিবেশী বিশেষভাবেই লক্ষ্য রাখিত। এই সময়ে আমার পথে বাহির হওয়া সম্ভবপর হইত না। এমনকি আমার গঙ্গাস্নানও বন্ধ করিতে হইয়াছিল। রাস্তায় মোটরগাড়ীর ছুটাছুটী—গঙ্গায় ষ্টীমলঞ্চের চলাচল বাড়িয়াছিল। শুনা যায়—আমাকে উধাও করিয়া লওয়ারই এই সকল ব্যবস্থা। এই সময়ে আমি একটী ঘরেই দিবারাত্র থাকিবার অবসর পাইয়াছিলাম। শুধু গভীর রজনীতে বিপ্লবীদের সহিত বসিয়া ইংরাজ-শাসনের সমাপ্তি আনার পরামর্শ চলিত।

শ্রীশচন্দ্র সব শুনিয়া বলিল "ব্যবস্থা তোমাকেই করিতে হইবে। তোমার সঙ্ঘের অনেক ছেলে, তাদের দিয়াই এই কাজ করিতে হইবে। বিপ্লবী বলিয়া পুলিস যাহাদের সন্দেহ করে, এই গুরুতর কার্য্যে তাহাদের অগ্রসর হওয়া উচিত নহে।"

আমি আমার প্রতিবেশী ভক্ত সত্যচরণকে ডাকিয়া সকল কথা জানাইলাম। সে এতদিন ভাঙ্গা রিভলভার সারিয়া বিপ্লবের কাজে সহায়তা করিত। রডার মজার পিস্তল অপহৃত হওয়ার সংবাদে সে অতিশয় উৎফুল্ল হইয়াছিল। অতঃপর সমস্ত কার্ত্তুজগুলি নিজেদের মধ্যে থাকিবে এবং কার্ত্তুজের প্রয়োজনে বাংলার সকল বিপ্লবদলকেই আমাদের কেন্দ্রে আসিয়া সম্মিলিত হইতে হইবে, এই আশায় সে সাহস করিয়া বলিল—সেই কার্ত্তুজগুলি আনার ব্যবস্থা সেই করিবে। আমি তাহাকে গুদামের ঠিকানা ও চাবী দিলাম। পরদিন প্রভাতে সে তাহার ভ্রাতাকে লইয়া প্রস্থান করিল। আমি অপরাহ্ণ হইতে দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত তাহাদের পুনরাগমনপ্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম। দূর হইতে নৌকা আসিতেছে। চাঁদের আলোয় গঙ্গাজল ছল-ছল নাচিতেছে। তালে-তালে নৌকা নিকটে আসিল। ভরা শ্রাবণের আকাশের জ্যোৎস্নার ম্লান আলো ফুটিয়াছে। চন্দ্রদেব মেঘের মধ্যে লুকাইয়া আছেন। সত্যচরণ লম্ফ দিয়া তীরে উঠিল। তাহাকে আলিঙ্গন দিলাম। আমরা কয়েক জন একে-একে কার্ত্তুজ ভরা বড়-বড় তোরঙ্গগুলি নদীতটে নামাইলাম। মাঝিরা জিজ্ঞাসা করিল "এই সকল তোরঙ্গে কি আছে বাবু?" সত্যচরণ উত্তর দিল—কলকব্জা। সত্যচরণ লোহার কাজ করিত। তাহাকে ঘড়িওয়ালা মিস্ত্রী এবং কেহ-কেহ শুধু মিস্ত্রী বলিয়াও ডাকিত। মাঝিরা বিদায় হইলে, সত্যচরণ বলিল "বিপদ্ বড় কম নয়। গুদামে প্রবেশ করিয়া দেখি—বাক্সভরা কার্ত্তুজ। এই বাক্স গরুর গাড়ী বোঝাই দিলে নিশ্চয় ধরা পড়িবে। আন্দাজ করিয়া বুঝিলাম—৫।৬টী

টিনের বড় তোরঙ্গে এই সকল মাল ধরিবে। ভোলাকে তোরঙ্গ কিনিতে পাঠাইলাম। তারপর বাক্স ভাঙ্গিয়া, কার্ত্তুজগুলি তোরঙ্গে পুরিয়া, উহাই বাহির করিয়া আনিয়াছি।"

নিরাপদে যে মালগুলি আসিয়াছে, এজন্য পুলকিত উৎসাহে ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম "তারপর ?"

সে বলিল "তোরঙ্গ-ভর্ত্তি মাল বাহির করার সময়ে দুই-চারি জন মাড়োয়ারী 'এ কোন চীজ্' বলিয়া প্রশ্ন করিল। আমরা কলকব্জা বলিয়া গরুর গাড়ী বোঝাই করিলাম, তারপর সোজাসুজি শেয়ালদহ ষ্টেশন। মাল বুক করিতে কিছু অর্থদণ্ড দিতে হইল। শ্যামনগর ষ্টেশনে নামিতে এক গোয়েন্দা পুলিস প্রশ্ন করিল 'এতগুলি তোরঙ্গে কি লইয়া যাইতেছেন ?'

"নানা কথায় তাহাকে ভুলাইয়া, এইবার ফরাসী চন্দননগরে পৌঁছিয়াছি। তোমার আদেশ পালন করিতে পারিয়াছি, আমার জীবন ধন্য হইয়াছে।"

সত্যচরণকে সেদিন সজল নেত্রে অন্তরের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলাম। কৃতজ্ঞতার ভাষা মুখ দিয়া বাহির হইল না। আমরা ধরাধরি করিয়া, কেহ-বা মাথায় লইয়া পরমোল্লাসে কার্ত্তুজগুলি নিশীথ রাত্রে বাড়ীতে আনিয়া তুলিলাম। হর্ষে ও উত্তেজনায় হৃদয় লম্ফ দিয়া উঠিতেছিল। ভারতের স্বাধীনতার সেই বিচিত্র ইতিহাসের উদ্যোগ-পর্ব্বের কথাই লিখিতেছি। ঘটনার পর ঘটনার এমন অসংখ্য বিচিত্র আলেখ্যে সে ইতিহাস সমুজ্জ্বল।

বৈপ্লবিক ঘটনা ও প্রচার

"অনুশীলন সমিতির" সহিত ক্রমেই চন্দননগর বিপ্লবী দলের এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক জন্মিল যে, একপ্রকার তাহাদের নেতৃরূপেই আমাকে

দাঁড়াইতে হইল। এই সময়ে নির্ম্মলচন্দ্র বক্সীর মধ্য দিয়া বরিশাল বিপ্লবী দলের সহিত সম্পর্কও দৃঢ় হওয়ায়, এই দলেরও নেতৃত্ব আমায় করিতে হইত। ইউরোপে মহাসংগ্রাম আরব্ধ হওয়ার পূর্ব্বে "অনুশীলন সমিতি" নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষকে হত্যা করে। হত্যাকারী সঙ্গে-সঙ্গে ধৃত হয়। তাহার বিচার লইয়া কলিকাতায় বিপ্লবীদের আন্দোলন আরও জাঁকাইয়া উঠার সুযোগ পায়। কেন-না হত্যাকারীর মামলা কলিকাতায় উচ্চ আদালতে দীর্ঘদিন চলে এবং উপর্য্যুপরি দুই বার বিচারে আসামী জুরীদের সমর্থনে মুক্তিলাভ করে। এই বিচারের ফলাফল দেখার জন্য বাংলার প্রত্যেক শিক্ষিত অধিবাসী উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতেন। আমরাও আমাদের বিপ্লবী দলকে পুষ্ট করার সুযোগ লইতাম।

নৃপেন্দ্রনাথ বিপ্লবীদের সন্ধান লইতেন এত অধিক, যাহার জন্য বাংলার বিপ্লবীরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। পরামর্শে স্থির হয় যে, চন্দননগর অনুশীলনের সহিত যুক্ত হইয়া নৃপেন্দ্রনাথকে হত্যা করিবে। দীর্ঘদিন ধরিয়া তাঁহার অনুসরণ করা হয়। অনুসরণকারীদের প্রত্যেকের হস্তেই ৫ চেম্বারের একটী করিয়া রিভলভার থাকিত। একদিন তিনি যখন চিৎপুর রোডের ট্রামগাড়ী হইতে অবতরণ করিতেছিলেন, একটী গুলীর আঘাতে তাঁহাকে ভূমিশায়ী করা হয়। এক আঘাতেই তিনি গতায়ুঃ হইয়াছিলেন। তখন পথের মোড়ে-মোড়ে গুপ্ত পুলিসের দল ছদ্মবেশে প্রহরারত থাকিত। হত্যাকারী নৃপেন্দ্রনাথকে গুলী করিয়া ভীড়ের মধ্যে পলাইবার চেষ্টা করিলে, গুপ্ত পুলিস-দল তাহাকে ঘিরিয়া ধরে। সে পাঁচ চেম্বার রিভলভার হইতে একটী গুলী করিতে সমর্থ হয়। এই গুলীর আঘাতে একজন পুলিস-কনেষ্টবল পঞ্চত্ব লাভ করার পর যুবক ধৃত হয়। তখনও তাহার হাতে গুলী-ভরা রিভলভার ছিল। রিভলভারটী তাহার নিকট হইতে ছিনাইয়া লওয়া হয়। এই তরুণের নাম নির্ম্মলকান্ত রায়।

"অনুশীলন সমিতির" এই কর্ম্মবীর ধৃত হইলে, আমরা অতিশয় ব্যথিত হই। নিম্ন আদালতে দীর্ঘদিন তাহার মামলা চলে। তারপর কলিকাতার উচ্চ আদালতে তাহার কেস সোপর্দ্দ করিয়া দেওয়া হয়।

প্রথম বিচারে ৯ জন জুরী তাহাকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করে। তাহার পুনর্ব্বিচার হয়। দ্বিতীয়বার বিচারেও নির্ম্মলকান্ত অধিকাংশ জুরীর মতে নির্দ্দোষ বলিয়া মুক্তি পায়। নির্ম্মলকান্তের উপর অত্যাচার কম হয় নাই। কিন্তু তাহার মুখ দিয়া একটী কথাও পুলিস বাহির করিতে পারে নাই। প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার নর্টন সাহেবের কৃতিত্বেই নির্ম্মলকান্ত মুক্তিলাভে সমর্থ হইয়াছিল। ইংরাজের উচ্চ বিচারালয়ে নির্ম্মলকান্ত মুক্তি পাইলেও, পুলিস তাহাকে ছাড়ে নাই। সে যে নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষকে অবধারিত হত্যা করিয়াছে, এই বিষয়ে তাহাদের মনে কোন সংশয় ছিল না। কিন্তু ইংরাজ-চরিত্র উচ্চ-গুণভূষিত। গুণের সমাদর করিতে ইংরাজ জানে। তাই নির্ম্মলকান্তকে ইংরাজ রাজশক্তি নর্টনের সুপারিশে পরে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাতে পাঠাইয়া দেয়। ইংরাজের আদালতে দোষী ব্যক্তিও নির্দ্দোষ বলিয়া প্রমাণিত হইলে, তাহার রেহাই ছিল। একজন স্বদেশের স্বাধীনতাপ্রয়াসী তরুণকে বিলাতের স্বাধীন আব্‌হাওয়ায় নূতনভাবে জীবন গড়িয়া তোলার সুযোগ দিতে তাঁহারা কার্পণ্য করেন নাই।

এই সময়ে একের পর এক বৈপ্লবিক ঘটনার শেষ ছিল না। চট্টগ্রামে গুপ্তচর সত্যেন সেনের হত্যাকারী যুবকের সন্ধানে পুলিস রত ছিল। গ্রীয়ার পার্কে এই ব্যক্তিকে ধৃত করা হয়। ধৃত ব্যক্তিও সর্ব্বদা আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে রাখিত। পুলিসের দল তাহাকে পর্য্যুদস্ত করিয়া ধরিয়া ফেলে। বিচারে অস্ত্র রাখার দায়েই সে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। হত্যার প্রমাণ পুলিস প্রদান করিতে পারে নাই। এদিকে কাশীর দল বর্ম্মাতে বিপ্লবের কেন্দ্র সৃষ্টি করে। শচীন্দ্রনাথ

সান্ন্যালই ইহার উদ্যোক্তা। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে একজন তামিল যুবক চম্পকরমণ পিলাই জুরীচে গিয়া যে বিপ্লব-সমিতি সংস্থাপিত করেন, তাহার সহিত এই বর্ম্মার সংহতি সংযুক্ত হয়। পরে ব্যাঙ্কক প্রভৃতি স্থানেও এই দলের শাখা বিস্তৃত হয়। পিলাই ভারত-বিপ্লবের একজন নেতৃরূপে জার্ম্মাণ জেনারেল ষ্টাফের সহিত পরিচিত হইয়া তথায় ইংরাজবিদ্বেষ-প্রচারের কাজে নিয়োজিত হন। তিনি অক্টোবর মাসে জুরিচ পরিত্যাগ করিয়া বার্লিনে জাতীয় দল গঠন করেন। জার্ম্মাণীর এই দলের সহিত ভারতীয় বিপ্লবীদের সম্পর্ক দৃঢ় হয়। রাসবিহারী এই সকল সংবাদ হরদয়ালের সহিত সংযুক্ত হইয়া রাখিত। রাসবিহারী চম্পকরমণ পিলাইয়েরও সহিত যোগাযোগ স্থাপন করে। জার্ম্মাণীও ভারতে ইংরাজ-বিদ্রোহের স্বপ্ন দেখিতেছিল। রাসবিহারী হরদয়ালের মারফৎ তারকনাথ দাস, বরকাতুল্লা, চন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী ও হেরম্ব গুপ্তের সহিতও পরিচিত হয়। কিন্তু এই সকল বিপ্লবীদের প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। চক্রান্ত ধরা পড়িলে, সান্‌ফ্রান্সিস্কোয় তাহার বিচার হয়। হরদয়ালের প্রেরণায় গধর পার্টির প্রথম দল ভারতে পৌছিলে, পাঞ্জাবের শিখ বিপ্লবীরা উৎসাহিত হয়; কিন্তু ইংরাজের ব্যবস্থায় এই "গধর" দল ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। ডেপুটী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এই সময়ে মুসলমানপাড়া লেনে বাস করিতেছিলেন। গোয়েন্দা গুপ্তচরেরা যেমন বিপ্লবীদের অনুসরণ করিত, বিপ্লবীরাও তেমনি বড়-বড় পুলিস কর্ত্তাদের চক্ষে-চক্ষে রাখিত। সংবাদ আসিল যে, মুসলমানপাড়া লেনে যে কক্ষে বসন্তবাবু বসেন, সেই কক্ষে তাঁহাকে নিহত করার সুযোগ আছে। পুলিসের অনুসরণকারীদের মধ্য হইতে এই প্রস্তাব আমার নিকট উপনীত হইল। শ্রীশচন্দ্র সম্মত হইল। আমি মণীন্দ্রনাথকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। মণীন্দ্রনাথ এই

সময়ে শোভাবাজারে তাহার শ্বশুরালয়ে থাকিয়া, শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে এম-এস্-সি. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। সে পুলিসের চক্ষে বহুদিন সংশয়ভাজন হইয়াছিল। নৃপেন্দ্রনাথের হত্যার পর সে নির্ম্মলকান্তের সঙ্গে ছিল বলিয়া শোভাবাজারে তাহার সংবাদ লওয়া হইয়াছিল। পুলিস কর্ম্মচারীদের মধ্যেও কয়েক জন আমাদের সহায় ছিলেন। তদানীন্তন কুমারটুলীর ইন্‌স্পেক্টর রামগোপাল মুখোপাধ্যায় এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। তিনি মণীন্দ্রনাথ বিপ্লবের কর্ম্মে সংযুক্ত নহে বলায় এবং সে বাড়ীতেই আছে, ইহা জানাইলে গোয়েন্দা পুলিসেরা ক্ষান্ত হয়।

মণীন্দ্রনাথ একটি বোমা-নির্ম্মাণ করিয়া দিল। যথাসময়ে "অনুশীলন সমিতির" একজন তরুণ গিয়া বোমা ছুঁড়িল। গভীর নিনাদে বোমা ফাটিল। ঘরের আস্‌বাবপত্র চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইল। বোমার ধোঁওয়ায় গৃহখানি আচ্ছন্ন হইল। কিন্তু যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বোমা-নিক্ষেপ, সেই ব্যক্তি তখন গৃহমধ্যে ছিলেন না। মরিল একজন হেড কনেষ্টবল। আহত হইল গৃহমধ্যে সকলেই। বসন্তবাবু এই যাত্রা রক্ষা পাইলেন। সংবাদপত্রে মুসলমানপাড়ার বোমা লইয়া বড়-বড় হরফে বার্ত্তা বাহির হইল; কিন্তু বসন্তবাবু নিহত হন নাই বলিয়া বিপ্লবকারীরা কিছু ক্ষুণ্ণ হইল।

যে কয় জন তরুণ বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন তরুণ বোমার টুকরায় গুরুতররূপে আহত হয়। সে চেতনা হারায়। তাহাকে অতি কৌশলে সহযোগী বন্ধুগণ দূরে লইয়া আসে এবং একটী ভাড়া গাড়ী করিয়া ঐই আহত অবস্থায় সাউথ ইউনিয়ন জুট মিলে নির্ম্মল বক্সীর নিকট লইয়া যাওয়া হয়। নির্ম্মলচন্দ্র আহত যুবককে ঘরে রাখিয়া, মিলের ডাক্তারকে ডাকিয়া পাঠান। ডাক্তার সব কথাই বুঝেন; কিন্তু নির্ম্মলবাবুর অনুরোধে এই কথা গোপন রাখেন। এক

মাস তাঁহার চিকিৎসায় যুবকটী পুর্ব্ব-স্বাস্থ্য ফিরিয়া পায়, তারপর আমার নিকট আসিয়া বলে "অতঃপর আমায় কি করিতে হইবে বলুন। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছি।" এই যুবকের নাম আনন্দ। তাহার অদম্য উৎসাহ দেখিয়া আমি সেদিন মুগ্ধ হই ও মনে-মনে আশ্বস্ত হই যে, যে বাংলায় এমন দেশব্রতী মৃত্যুঞ্জয়ী তরুণদের জন্ম, সেই বাংলা কোন মতে পরাধীন থাকিবে না। বাংলার স্বাধীনতা সমগ্র ভারতকে অভিনব শক্তি দিবে। স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন বাঙ্গালীজাতি ব্যর্থ হইতে দিবে না।

তন্ত্র ও বেদান্ত

শ্রীঅরবিন্দের পত্র আসিল। পণ্ডিচেরী হইতে তিনি লিখিয়াছেন "তন্ত্রের স্থলে বেদান্তের সাধনাই অতঃপর আমাকে আশ্রয় করিতে হইবে।" তিনি আরও সতর্কতাচ্ছলে জানাইয়াছেন "বোমা ও রিভলভারের সহিত 'আর্য্য' যেন মিশিয়া না থাকে।"

তন্ত্র অর্থে শ্রীঅরবিন্দের সাঙ্কেতিক ভাষায় বীরাচারী বিপ্লব বুঝাইত এবং বেদান্ত অর্থে যোগসিদ্ধ অধ্যাত্মানুভূতি। বুঝিলাম—অরবিন্দের অন্তরের উদ্দেশ্য—স্বচ্ছ অধ্যাত্মভিত্তির উপর অতঃপর নব জাতি গড়িয়া তোলারই এখন তিনি প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন ও সেই দিকেই তিনি আমার গতির দিক্-পরিবর্ত্তন করার নির্দ্দেশ দিতে চাহিতেছেন।

কথাটা বিপ্লবী বন্ধুদের মধ্যে প্রচারিত হইল। তাঁহারা অনেকেই আসিলেন। রাসবিহারী শ্রীঅরবিন্দের পত্রখানি হাতে লইয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। শচীন সান্ন্যাল ও গিরিজা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইল। অমরেন্দ্রনাথ ও রামচন্দ্র মজুমদার আমায় ধরিয়া বসিলেন—অতঃপর আমি কি করিব ? আমি তদুত্তরে বিপ্লবের পথে যেমন আছি, তেমনিই থাকিব বলিয়া স্বীকার করি এবং তদনুযায়ী কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকি। কিন্তু অন্তরে দিক্-পরিবর্ত্তনের আভাস ক্রমেই যেন স্পষ্ট হইয়া

উঠিতেছিল। বর্ত্তমান পরিণাম তাহার সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু সেদিন বিপ্লবের কর্ম্মে আমার কোন প্রকার অনুৎসাহ দেখা যায় নাই। একদিকে সশস্ত্র বিপ্লবের সাধনা, অন্যদিকে শ্রীঅরবিন্দ-নির্দ্দেশিত যোগজীবনের প্রেরণা—দুই ধারাই আমার জীবনের উপর দিয়া বহিয়া চলিল। এই দোটানার মধ্যেই যথাসাধ্য সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, আমি আরব্ধ বিপ্লবকার্য্যে সহায়তা করিয়া চলিলাম।

ভারতব্যাপী বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের আয়োজন বিশ্বাসঘাতকতায় ব্যর্থ

রাসবিহারী ভারতে বিপ্লব আনিতে চাহিয়াছিল ইউরোপের প্রথম যুদ্ধারম্ভে। কাইজার যখন যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, সঙ্গে-সঙ্গেই রাসবিহারী মহারাষ্ট্রবীর পিঙ্গলেকে পাঠাইয়া দিল দিল্লীতে সেনাদলের মধ্যে বিপ্লববীজ রোপণ করার কাজে। কাশীতে শচীন সান্যাল বেনারস ক্যান্টন্‌মেণ্টের সেনাবাহিনীতে বিপ্লবাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার চেষ্টা করে। লাহোরে পিঙ্গলের ষড়যন্ত্র ধরা পড়িয়া যায়; সঙ্গে-সঙ্গে কাশীর ক্যান্টন্‌মেণ্টে যে বিপ্লব-সৃষ্টির প্রয়াস হইয়াছিল, তাহাও ধরা পড়ে। পিঙ্গলে মীরাটে গিয়া ধৃত হন এবং সৈন্যদের মধ্যে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে তাঁহার ফাঁসী হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ—ভারত-ব্যাপী বিপ্লবের দিন স্থির হয়। ঐদিন আমরা গঙ্গাতীরে বসিয়া বিপ্লবের সংবাদ শীঘ্র পাইব বলিয়া আশা করিতেছিলাম। শ্রীশচন্দ্র ঐ বিষয়ে খুবই আশান্বিত হইয়াছিল। আমি অনুভূতির মধ্যে কোনও আলোকের সন্ধান না পাইয়া, তাহাকে বলি—গঙ্গার জলে রক্তের আভা দেখা যাইতেছে না। বোধ হয় বিপ্লব-সৃষ্টি সম্ভবপর হয় নাই। পরদিন প্রভাতেই সংবাদপত্রে পড়িলাম যে, লাহোরে একজন গুপ্তচর বিপ্লবের ষড়যন্ত্র ফাঁস করিয়া দিয়াছে। বেনারসেও বহু সৈনিক ধৃত হইয়াছে। তার পরদিন

শচীন্দ্র সান্যাল চন্দননগরে পৌঁছিয়া সংবাদ দিল যে, কয়েক জন বিশ্বাস-ঘাতক সৈনিক লাহোর ও কাশীর বিপ্লবের ষড়যন্ত্র পূর্ব্ব হইতে ইংরাজদের জানায় এবং তাহার ফলে ভারতব্যাপী বিদ্রোহসৃষ্টির আয়োজন ব্যর্থ হইয়া যায়। পিঙ্গলের সহিত রাসবিহারীর মীরাট-গমনের সংবাদও আমরা শুনিলাম। উদ্বিগ্নচিত্তে রাসবিহারীর আগমন-প্রতীক্ষায় আমরা রহিলাম।

বাংলায় নূতন অভিযান

২১শে ফেব্রুয়ারীর বিপ্লব-প্রচেষ্টা পশ্চিমোত্তর ভারতে ব্যর্থ হইলে, কয় জন বিপ্লবনেতা একত্র হইয়া বাংলায় বিপ্লব-সৃষ্টির পরিকল্পনা করেন। কলিকাতায় "শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের" দোকানে যথারীতি এক প্রাথমিক পরামর্শসভার অধিবেশন হয়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রামচন্দ্র মজুমদার ও নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য। অধিবেশনে স্থির হয় যে, ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে উত্তরপাড়ার গঙ্গাতটে যে জোড়া শিব-মন্দির আছে, মধ্যরাত্রে সেখানে উপস্থিত হইয়া চরম কর্ম্মসূচী নির্দ্ধারণ করা হইবে। এই সংবাদ যথাসময়ে আমার নিকট প্রেরিত হয়। আমি শ্রীশচন্দ্রকে সকল কথাই বলি। নির্দ্দিষ্ট দিনে এই সভায় যোগদানের জন্য একখানি পান্সী ভাড়া করিয়া আমি ও শ্রীশচন্দ্র রাত্রের অন্ধকারে উত্তরপাড়াভিমুখে যাত্রা করি। সঙ্গে নলিনচন্দ্রকেও লওয়া হইয়াছিল।

আমরা মধ্যরাত্রে উত্তরপাড়ায় গিয়া উপনীত হই। একটী মিটমিটে প্রদীপ জ্বালাইয়া অমরেন্দ্রনাথ প্রমুখ বিপ্লবনেতৃগণ আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আমরা উপস্থিত হইলে, সকলের মধ্যেই উৎসাহের সঞ্চার হইল এবং বিপ্লবের কাজে আমরা কি-ভাবে অগ্রসর হইব, সেই কথা লইয়া আলোচনা সুরু হইল।

অনেক আলোচনার পর এই সভায় স্থির হয় যে, পুনরায় বিপ্লব আনিতে হইলে, প্রচুর অর্থ ও অস্ত্রবল চাই। বাটাভিয়ায় ও ব্যাঙ্ককে যে দুইটী বিপ্লবকেন্দ্র সংস্থাপিত আছে, সেখানে লোক পাঠাইয়া সাংহাইয়ের কন্সাল-জেনারেলের সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া জার্ম্মাণী হইতে অস্ত্র আমদানী করার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ভার নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য গ্রহণ করিলেন। আর অর্থসংগ্রহের ভার লইলেন স্বয়ং যতীন্দ্রনাথ। রাত্রি প্রায় শেষ হয়, আমরা নৌকায় আসিয়া বসিলাম। জোয়ারের প্রবল টানে তরণী ভাসিল। চন্দননগরে উপস্থিত হইয়া "অনুশীলন সমিতির" গিরিজাবাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলাম।

গিরিজাবাবু আসিলেন। তাঁহার সহিত পরামর্শ করা হইল। তিনি পূর্ব্ববঙ্গে ডাকাতি করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিবেন বলিলে, নির্ম্মলচন্দ্রকে সকল কথা বলিলাম। সে বরিশাল সমিতির সহিত সংযুক্ত ছিল। বরিশালের নেতৃপুরুষগণকে এই বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করার ভার সে গ্রহণ করিল। আমরা বাংলায় দ্বিতীয় বার বিপ্লব-স্মৃষ্টির কাজে মন দিলাম।

অর্থ ও অস্ত্র-সংগ্রহের প্রয়াস

১৩ই ফেব্রুয়ারী যতীনবাবু বিপিন গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে এক শক্তিশালী দল লইয়া গার্ডেন রীচে ডাকাতি করিলেন। একখানি ট্যাক্সীতে চড়িয়া ৪।৫ জন কর্ম্মী এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। সাউথ ইউনিয়ন জুট মিলে প্রতি সপ্তাহের শনিবারে বার্ড কোম্পানী প্রচুর টাকা পাঠাইত। দ্বারবান্ সহ বার্ড কোম্পানীর গাড়ী এই ট্যাক্সীর নিকটবর্ত্তী হইলে, তৎক্ষণাৎ ট্যাক্সী হইতে তরুণগণ গাড়ী থামাইয়া প্রায় ১৮,০০০৲ টাকা লুঠ করে। শ্রমিকদের হপ্তা দিবার জন্য টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানী, আনী ভিন্ন-ভিন্ন থলিয়াতে ভর্ত্তি করা ছিল। সেইগুলি

ট্যাক্সীতে চাপাইয়া বিপ্লবিগণ উধাও হয়। পরে এই অর্থ নানা বিপ্লব-সংহতির মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। চন্দননগরে যে কয়টী থলিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতে দুই হাজার টাকার আনী ও পাঁচ হাজার টাকার সিকি ও আধুলি ছিল। ইহার প্রায় এক সপ্তাহ পরেই বেলিয়াঘাটায় একজন চাউল সরকার ২০,০০০৲ টাকা লইয়া গদীতে ফিরিতেছিল; যতীন মুখার্জীর দল এই ব্যক্তির হাত ছিনাইয়া উক্ত ২০,০০০৲ টাকা সংগ্রহ করে। এই টাকা নোটে থাকায়, অপসারণের অসুবিধা হয় নাই। কিন্তু ট্যাক্সীর ড্রাইভার ইহা প্রত্যক্ষ করায়, তাহাকে হত্যা করা হয়। তারপর ট্যাক্সী চালাইয়া যতীনবাবু দল-বল সহ পলায়ন করেন।

ইহার কয়েক দিন পরে যতীনবাবু যখন পাথুরিয়াঘাটায় এক বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন এবং অর্থ-সংগ্রহের জন্য পরবর্ত্তী বিষয় লইয়া বিপ্লবীদের সহিত আলোচনায় রত ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে নীরদ হালদার নামক এক ব্যক্তি তথায় গিয়া উপস্থিত হয়। সকলেই জানিত যে, যতীন ছদ্মবেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। হঠাৎ সে যতীনবাবুকে দেখিয়া চিনিয়া ফেলে এবং "এই যে যতীনবাবু" বলিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হয়। এই ব্যক্তি পাছে যতীনবাবুর সংবাদ অন্যত্র প্রকাশ করে, এই আশঙ্কায় তৎক্ষণাৎ তাহাকে হত্যা করা হয়। যতীনবাবু সদলবলে তথা হইতে প্রস্থান করেন।

ইহার কয়েক দিন পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তনোৎসব। লাট সাহেব আসিবেন। সারা পথ জনশূন্য করা হইতেছিল। পুলিস-প্রহরীরা সজাগ হইয়া লাটের জীবনরক্ষার কাজে সতর্ক ছিল। বাংলায় বিপ্লবের বহ্নিশিখা তখন ধূ-ধূ করিয়া জ্বলিতেছিল। এই সময়ে পুলিস-প্রহরীরা উচ্চ ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীদের জীবন-রক্ষার দায়ে খুবই চিন্তিত। হঠাৎ পুলিস-ইন্‌স্পেক্টর সুরেশ মুখার্জীর দৃষ্টি পড়ে এক পলাতক বিপ্লবীর প্রতি। এই যুবক পথের এক পাশে দাঁড়াইয়াছিল।

সুরেশবাবু তাহার নিকটবর্ত্তী হইলে, সেই ব্যক্তি গুলী চালায়। ইন্‌স্পেক্টরের দেহরক্ষক অস্ত্রাঘাতে জখম হয়। এই পলাতক বিপ্লবীর সহিত আরও তিন জন বিপ্লবী আসিয়া যোগদান করে। সে এক উত্তেজনাময় পরিস্থিতি! কে কোন্ দিকে তখন পলাইবে, তাহার স্থিরতা থাকে না। সকলেই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলায়। বিপ্লবিগণও সঙ্গে-সঙ্গে অন্তর্হিত হয়। যতীন্দ্রনাথ দূরে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিয়া হাসিতেছিলেন।

তখন প্রতুল গাঙ্গুলী ধরা পড়িয়াছে। প্রথম বিপ্লবের প্রচেষ্টাকালে "অনুশীলন সমিতির" কেদারেশ্বর গুহ ব্যাঙ্ককে গিয়া জার্ম্মাণীর সহিত ভারতে বিপ্লব-সৃষ্টির আয়োজনের সংবাদ আনিয়াছিলেন। বাংলায় এই দ্বিতীয় বিপ্লব-সৃষ্টি-চেষ্টার সূচনাকালেই নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যকে ব্যাঙ্ককে পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেই নরেন্দ্রনাথই পরবর্ত্তী যুগের মানবেন্দ্রনাথ রায়। তাঁহার মুখেই সংবাদ পাওয়া গেল যে, জার্ম্মাণী হইতে অস্ত্র পাওয়া যাইবে। বাটাভিয়ায় জার্ম্মাণীদের এক সভায় স্থির হয় যে, 'ম্যাভারিক' নামক এক জাহাজে ৩০ হাজার রাইফেল, প্রত্যেকটীর ৪০০টী কার্ত্তূজ এবং ২ লক্ষ টাকা করাচীর বন্দরে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। আমরা তৎক্ষণাৎ নরেন্দ্রনাথকে জানাইলাম—জাহাজ করাচী বন্দরে না পাঠাইয়া, বাংলায় উহা যেন প্রেরণা করা হয় এবং তদনুযায়ী হাতিযায়, রায়মঙ্গলে এবং বালেশ্বরে লোক মোতায়েন করার ব্যবস্থা হয়। "অনুশীলন সমিতি" হাতিয়ায় লোক নিযুক্ত করার ভার গ্রহণ করেন। রায়মঙ্গলে কলিকাতার বিপ্লব-সংহতি উপযুক্ত লোক প্রেরণ করেন। বালেশ্বরে চিত্তপ্রিয়কে লইয়া স্বয়ং যতীন্দ্রনাথ গমন করেন। কথা ছিল—ষ্টীমার বঙ্গোপসাগরে উপস্থিত হইয়া, তাহার আগমন-সংবাদ নিশান উড়াইয়া জানাইলে, সমুদ্রতীরবর্ত্তী এই তিন স্থানের যে কোন স্থানে বিপ্লবনেতৃগণ সঙ্কেত-

মত জাহাজ ভীড়াইয়া অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করার ব্যবস্থা করিবে। হায়, জাহাজ আসিল না! বিপ্লবীদের এ প্রয়াসও ব্যর্থ হইল। কিন্তু বাংলার বিপ্লবিগণ তাহাতে নিরাশ হইল না।

মার্চ মাসের প্রথমেই জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী বোম্বাই আসিয়া পৌছান। তাঁহার মুখে বাংলার বিপ্লবীরা জানিতে পারে যে, পূর্ব্ব-নীতির পরিবর্ত্তন হওয়ায়, জার্ম্মাণী হইতে অস্ত্র সরবরাহ করা হয় নাই। বিপ্লবীদের কোন বিশিষ্ট প্রতিনিধিকে শীঘ্রই বাটাভিয়ায় প্রেরণ করিতে হইবে। আমরা এই সংবাদ পাইয়া অবনী মোহন মুখার্জীকে বাটাভিয়ায় প্রেরণ করি। ভূপতি মজুমদারও সম্ভবতঃ এই সময়েই সিঙ্গাপুরে প্রেরিত হইয়া জাহাজের মধ্যেই গ্রেপ্তার হন।

রাসবিহারীর জাপানযাত্রা

রাসবিহারীর সংবাদের জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলাম। তাঁহার সহকর্ম্মিগণ সকলেই একে-একে ধৃত হইতেছিল। লাহোরের ক্যান্টন্‌মেণ্টে সিপাহীদের মধ্যে ধরপাকড় আরম্ভ হইয়াছে শুনিয়া, রাসবিহারী লাহোরে থাকা আর নিরাপদ্ নয় মনে করিয়া, কাশীতে চলিয়া আসে। রাসবিহারীর যে সকল বিশ্বস্ত সহকারী এই সময়ে ধৃত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কয়েক জনের নাম এইখানে উল্লেখ করা উচিত। বোমা ও অস্ত্রসহ ইঁহারা ধৃত হওয়ায়, মুক্তির আশা ইঁহাদের আর ছিল না। বিদ্রোহ-সৃষ্টির অভিযোগে ইঁহাদের সকলকেই ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিতে হইয়াছিল। এই সকল স্বাধীনতা-ব্রতী শহীদদের রক্ত ব্যর্থ হইতে পারে না বলিয়াই আমি আজিও বিশ্বাস করি।

ইঁহাদের নাম আমরা চিরদিন স্মরণে রাখিব। দিল্লীর আমীরচাঁদ, আউধবিহারী, বালমুকুন্দ, বালরাজ, পিঙ্গলে, কর্ত্তার সিং, মথুর সিং

জগৎ সিং, নিধন সিং—এই সকল পঞ্জাবকেশরীর কথা চিরদিন আমরা স্মরণে রাখিব। রাসবিহারী এই সকল বীরবৃন্দের গ্রেপ্তার-সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত নিরাশ হইয়াই লাহোর পরিত্যাগ করে। তাঁহার সঙ্গে সেদিন ছিলেন এক মহারাষ্ট্রীয় যুবক বিনায়ক রাও। আমরা তাঁহাকে সত্যেন বলিয়া ডাকিতাম। এই যুবকের পরিণাম অতিশয় নিদারুণ হয়। সে কথা আর এখানে বলিবার প্রয়োজন নাই।

গাজিয়াবাদে ট্রেণ বদল করিয়া তাহারা কাশীতে আসিয়া উপনীত হইল। কিন্তু এই সময়ে রাসবিহারীর দক্ষিণ হস্ত শচীন্দ্রনাথ চন্দননগরে ছিল। কাশীতে আসিয়াই রাসবিহারী শুনিল যে, চন্দননগর বিপ্লব-সংহতির প্রাণস্বরূপ শ্রীশচন্দ্রও 'ইন্‌গ্রেস অফ ইণ্ডিয়া এক্টে' ধৃত হইয়াছে। রাসবিহারী আর কালবিলম্ব না করিয়াই চন্দননগরাভিমুখে রওনা হইলে, সংবাদ পাইয়া চন্দননগরের পশুপতি ওরফে জ্যোতিষ সিংহ মগরা ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া তাহাকে সেইখানেই নামাইবার প্রস্তাব করে। তাহাদের আশা ছিল যে, ত্রিবেণী হইতে নৌকাযোগেই চন্দননগরে নিরাপদে আসিতে পারিবে। কিন্তু দারুণ দুর্য্যোগ হওয়ায়, সে আশা তাহাদের ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। অতঃপর ট্রেণযোগেই চন্দননগর ষ্টেশনে তাহারা উপস্থিত হয়। ষ্টেশনে তখন 'টিকটিকি'র দল ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। কিন্তু সাহসে ভর করিয়া তাহারা ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া আসিল। রাসবিহারীকে লইয়া পশুপতি নরেশচন্দ্র সেনের বাড়ীতে তুলিল। ষ্টেশন-রোডের উপর প্রসিদ্ধ নকুড় করের বাড়ী ছিল নরেশচন্দ্রের বসতবাটী। নরেশচন্দ্র রাসবিহারীকে সযত্নে দিবাভাগে রক্ষা করে; রাত্রে রাসবিহারী আমার বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হয়।

২১শে ফেব্রুয়ারীর বিদ্রোহ-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায়, শ্রীশচন্দ্র অতিশয় হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায়, আবার যে বাংলার

বিপ্লবিগণ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে, এ প্রত্যয় সে যেন আর করিতে পারিতেছিল না। আমার নীতি ছিল "কর্ম্মণ্যেব অধিকারস্তে"—কর্ম্মের অধিকার লইয়াই চলিতাম। ফল-প্রত্যাশা আমার ছিল না। কোন-রূপ দুর্ঘটনায় আমি দমিতাম না। এই ব্যর্থতায় শ্রীশচন্দ্রের একেবারে হৃদয়-ভঙ্গ হয় এবং ইচ্ছা করিয়াই সে চন্দননগর হইতে বাহির হয়। ফিরিবার সময়ে হাওড়া ষ্টেশনে সে ধরা পড়ে। রাসবিহারী এই সকল কথা শুনিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিল "অতঃপর আমরা কি করিব ?"

আমি তাহাকে বিদেশে যাওয়ার অনুরোধ জানাইলাম। ইতঃপূর্ব্বে একবার জাপানের টিকিট পর্য্যন্ত খরিদ করিয়াও সে স্বদেশ ছাড়িয়া বিদেশ-গমনে সম্মত হয় নাই। খরিদ-করা টিকিটখানি সে খণ্ড-খণ্ড করিয়া সেদিন ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। কিন্তু আমার কথায় এইবার সে প্রবাসে যাইতে রাজী হইল।

আমি তাহাকে আমাদের অস্ত্র আমদানীর কথা জানাইলাম। যদি প্রচুর অস্ত্র মিলে, বাংলার তরুণেরা সংগ্রামে কাতর হইবে না, এই কথা শুনিয়া রাসবিহারী বলিল "সত্যই বলিয়াছ। যদি অস্ত্রবল থাকিত, আমরা সৈন্যশ্রেণীকে উত্তেজিত করার দুর্গম পথে যাইতাম না।" বিদ্রোহ সৃষ্টি করার মানুষ আছে অসংখ্য। বাংলায় ৫০ হাজার তরুণ স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বলি দিতে পারে। এই কথা শুনিয়া রাসবিহারী লম্ফ দিয়া উঠিল, বলিল "শুধু অস্ত্র নয়, বিদ্রোহ-সৃষ্টির জন্য প্রচুর অর্থেরও প্রয়োজন। চুরি-ডাকাতি করিয়া সে অর্থ সঞ্চয় করা সম্ভবপর নহে। আমি বিদেশেই যাইব। তোমরা আমার যাত্রার ব্যবস্থা কর।"

আমি আরও জানাইলাম "আমরা ভারতে বিদ্রোহ-সৃষ্টির অনেক আয়োজন করিয়াছি। ২১শে ফেব্রুয়ারীর প্রথম প্রচেষ্টা আমাদের ব্যর্থ হইলেও, আমরা জার্ম্মাণীর সহিত ইংরাজের এই যুদ্ধকালেই পুনরায়

বিদ্রোহের আয়োজন করিব। এই জন্য বাংলার বিপ্লবিগণ অনেকখানি প্রস্তুত হইয়াছে। তাহারা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। 'হ্যারী এণ্ড সন্স' নামে একটা কোম্পানী বিপ্লবীরা খুলিয়াছে। শীঘ্রই জার্ম্মাণী হইতে প্রচুর টাকা এই কোম্পানী মারফত পাওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে। নরেন্দ্রনাথ ও অবনী মুখার্জ্জী এই জন্য ব্যাঙ্ককে ও চীনে গিয়াছে। সাংহাইয়ের জার্ম্মাণ কন্সাল-জেনারেলের নিকট অস্ত্র ও অর্থ পাঠাইবার তাগিদ দিতে হইবে। তুমি শীঘ্রই জাপানে চলিয়া যাও। তোমার মত লোক এই সময়ে বিদেশে থাকিলে কর্ম্মসাফল্য অবশ্য হইবে।"

শ্রীশচন্দ্রের জন্য রাসবিহারীর যতটা মনোভঙ্গ হইয়াছিল, তাহা কিছুটা দূর হইল। তাহাকে নৌকাযোগে নিরাপদ্ স্থানে উপস্থিত পাঠাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিলাম। বিনায়ক রাও, জ্যোতিষ সিংহ ও আমার কয়েকটি সহকারী ছাত্রসহ তাহাকে মগরায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল। মগরা হইতে রাসবিহারী নবদ্বীপে গিয়া কিছুদিন বাস করিবে, ইহাই ছিল আমাদের পরিকল্পনা। নবদ্বীপ নিরাপদ্ স্থান মনে করিয়া একটী বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছিল। ঠাকুর অর্থাৎ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী এই সময়ে নবদ্বীপে থাকিতেন। বিনায়ক রাও ও জ্যোতিষ সিংহের সহিত রাসবিহারী নবদ্বীপেই প্রস্থান করিল।

আমরা ইতিমধ্যে গিরিজা ও শচীন্দ্রনাথকে লইয়া রাসবিহারীকে জাপানে পাঠাইবার পরামর্শ করিলাম। তখন টাকা আমাদের হাতে ছিল না। গিরিজাবাবু টাকার ভার গ্রহণ করিলেন। সম্ভবতঃ এই সময়েই দালান্দা জেল হইতে বিপ্লবী নলিনী ঘোষ ও প্রবোধ দাশগুপ্ত "অনুশীলন সমিতির" দুইজন বন্দী—কৌশলে জেল হইতে বাহির হইয়া, সারা পথ হাঁটিয়া মধ্য-রাত্রে আমার দরজায় কড়া নাড়েন। প্রতি রাত্রেই আমি এইরূপ ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাকিতাম। দরজা খুলিয়াই দেখি—দুই পরিচিত মূর্ত্তি—নলিনী ও প্রবোধ। তাহাদের সালিঙ্গনে বৈঠকখানায়

বসাইলাম। সে যুগে বিপ্লব-যজ্ঞে দিবারাত্র আমাদের সমান ছিল। গৃহদেবী প্রবোধ ও নলিনীকে খিচুড়ি রাঁধিয়া খাওয়াইলেন। তার পরদিন বাংলার নূতন বিদ্রোহায়োজনের সকল কথা তাহাদের শুনাইলাম। শচীন্দ্রনাথ নলিনীকান্তকে জব্বলপুরে পাঠাইয়া দিল। উত্তর ভারতের বিদ্রোহসৃষ্টির আয়োজনও তখন আবার পুরাদমেই চলিয়াছে।

রাসবিহারী নবদ্বীপ হইতে আমায় জানাইল যে, পঞ্জাব হইতে প্রতাপ সিং আসিতেছে। আমি রাসবিহারীর মুখেই এই তরুণের কথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম। আমীরচাঁদই প্রতাপ সিংকে দেশসেবার কাজে রাসবিহারীর হস্তে অর্পণ করেন; সেইদিন হইতে প্রতাপ সিং রাসবিহারীর সকল কাজে সহায়তা করিত। আমি প্রতাপ সিংকে চন্দননগরে আসিতে খরচ পাঠাইলাম। প্রতাপ সিং আসিল। দীর্ঘ কেশ, দীর্ঘ শ্মশ্রু, জাতিতে শিখ। দীর্ঘ পাঞ্জাবী পরিয়া অটল হিমাদ্রির ন্যায় আমার সম্মুখে সে দাঁড়াইল। সে বলিল "আপনার কথা শুনিয়াছি; দেখার সুযোগ এতদিনে পাইলাম!"—বলিয়া এই সিংহশিশু আমায় প্রণাম করিল।

বিশ্রামের পর সে অসঙ্কোচেই আমার নিকট হইতে গঞ্জিকা চাহিল। বিপ্লবীদের এইরূপ অভ্যাস আমি কোনদিন দেখি নাই। কিন্তু অতিথিকে বিমুখ করিলাম না। গঞ্জিকা আনাইয়া দিলাম। গঞ্জিকা-সেবনে তাহার চক্ষুঃ অধিকতর আরক্ত হইল। চক্ষুঃ দুইটা জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় দেখা গেল। বজ্রগম্ভীর স্বরে সে বলিল "বাবুজি, রাসবিহারীর সহিত আমার সাক্ষাৎ করার প্রয়োজন। তিনি কোথায় আছেন বলুন।" আমি জ্যোতিষ সিংহের সহিত তাহাকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া দিলাম। রাসবিহারীর নির্দ্দেশে পঞ্জাবে গিয়া সে পুলিসের হাতে ধরা পড়ে এবং জেল-হাজতেই তাহার মৃত্যু হয়। এই গঞ্জিকাসেবী

দেশপ্রেমিকের কথা যত ভাবি, ততই রাসবিহারীর কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া বিস্মিত হই।

প্রায় মে মাসের প্রথমে গিরিজা আসিয়া জানাইলেন যে, অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে। জ্যোতিষ রাসবিহারীকে আনিতে ছুটিল। রাস-বিহারী চুঁচুড়া ষ্টেশনে নামিয়া, একখানি ঠিকা গাড়ীতে করিয়া আমার বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল। গিরিজা ও শচীন উভয়ে রাসবিহারীর সহিত পরামর্শ করিয়া নিপ্পন কোম্পানীর "শানকীমারা" জাহাজে তাঁহাকে পাঠাইবার সিদ্ধান্ত করিল। কিন্তু কি নামে টিকিট করা হইবে, এই লইয়া গোল বাধিল। রাসবিহারী বলিল "সম্প্রতি রবীন্দ্র-নাথ জাপানে যাইবেন, স্থির হইয়াছে। দেরাদুনে যখন থাকিতাম, পি-এন-ঠাকুরের নামে এক 'ভিলা' আমার চক্ষে পড়িত—টিকিটখানি পি-এন-ঠাকুর নামেই খরিদ করা হউক। রবীন্দ্রনাথের ব্যবস্থার জন্য পূর্ব্ব হইতেই যেন তাঁহার কোন আত্মীয় যাইতেছেন। অতএব সংশয়ের কোনই কারণ থাকিবে না।"

শচীন্দ্রনাথ তদনুযায়ী জাপান যাওয়ার এক টিকিট খরিদ করিয়া আনিল। আমি সাগরকালী ঘোষকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। এংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলে তিনি কার্য্য করিতেন। গঙ্গা পার হওয়ার জন্য তাঁহার একখানি নিজের নৌকা ছিল। আমরা কালীবাবুকে বলিয়া সদল-বলে রাসবিহারীকে কাঁকিনাড়ায় পাঠাইয়া দিয়া আসিলাম। শচীন্দ্রনাথকে লইয়া গিরিজাও তাহার সঙ্গে প্রস্থান করিলেন।

তাহার পরদিনই শচীন্দ্র সান্যাল আমাকে একখানি পত্র দিয়া বলিল "ইহা রাসবিহারীর পত্র।" আমি পত্রখানি না খুলিয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম "অগ্রে তাহার নিরাপদে ষ্টীমারে উঠিবার কথা বল।"

শচীন বলিল "আমরা কলিকাতার বাসা হইতে দুইখানি গাড়ী করিয়া সোজা খিদিরপুর ডকে গিয়া উপস্থিত হই। রাসবিহারীবাবু

মজার পিস্তলটী আমার হাতে তুলিয়া দেন। গিরিজাও একটী মজার পিস্তল লইয়া তাঁহার গাড়ীতে উঠেন। আমি পশ্চাদ্বর্ত্তী গাড়ীখানিতে চড়িয়া বসি। সোজা ৬ নম্বর খিদিরপুর ডকের গেটে গিয়া আমাদের গাড়ী দাঁড়ায়। তারপর জাপানের চিকিৎসক আসিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করেন এবং জাহাজে উঠিবার অনুমতি জানান।

"রাসবিহারীবাবু যেরূপ করুণ চক্ষে আমাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, সে স্মৃতি কোনদিন মন হইতে মুছিবে না।"

শচীন্দ্রনাথ কাঁদিয়া ফেলিল। গিরিজা মাথা নত করিলেন।

আমি বলিলাম "তারপর ?"

গিরিজা বলিলেন—"তারপর তীরে দাঁড়াইয়া দেখিলাম—রাস-বিহারীবাবু ডেকে উঠিয়াছেন। পিছন দিকে না চাহিয়া, তিনি ধীরপদে জাহাজে প্রবেশ করিলেন। আমাদের দুইজনের হাতে দুইটী মজার। তাড়াতাড়ি গাড়ী চড়িলাম।"

গিরিজাও একটী হৃদয়ভেদী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

১২ই মে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ। স্বাধীনতার অগ্রদূত বাংলার এক অদ্বিতীয় বীর জাপানের অভিমুখে প্রস্থান করিল। ইহার সুদীর্ঘকাল পরে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত আসিয়াও তাহার ভারতভূমি স্পর্শ করার সুযোগ হইল না—বিধাতার নিষ্ঠুর বিধানে। রাসবিহারী আজ পরলোকে।

গ্রেপ্তার ও গোপনচারী

রাসবিহারী বসু ভারত-ত্যাগ করেন মে মাসের মধ্যভাগে। ইতঃ-পূর্ব্বে মার্চ মাসে চিত্তপ্রিয় প্রভৃতিকে লইয়া যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বরে যান। শচীন্দ্রনাথ পূর্ব্ব হইতেই গা ঢাকা দিয়া চলিতেছিল। পুলিস তাহার সন্ধান করিতে পারে নাই। প্রিয়লাল ও বিভূতি নামক দুইটী যুবক বেনারস ক্যাণ্টন্‌মেণ্টে সিপাহীদের লইয়া বিপ্লবের ষড়যন্ত্রে ধৃত হন।

রাসবিহারীর অন্বেষণতৎপর হইয়া পুলিস বিপ্লবীদের ধরিবার জন্য জাল ছড়ায়। তাহার ফলে অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বহু রাষ্ট্রবিপ্লবীকেও গা-ঢাকা দিতে হয়। অমরেন্দ্রনাথ সংগোপনে চন্দননগরে আসিয়া উপস্থিত হন। এই সঙ্গে অতুলচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জ্জী, সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতিও চন্দননগরে আসিয়া স্থান লইলেন। বসন্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মন্মথও ইঁহাদের সঙ্গী ছিল। সে দুর্দ্দিনের কথা স্মরণ করিলেও, লোমহর্ষণের সহিত আনন্দেরও উদ্রেক হয়। সেই সময়ে কাজ আমাদের খুবই বাড়িয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যার পর আমার বাড়ীর বহিঃপ্রাঙ্গণে বাংলার বিপ্লবনেতৃগণ মিলিত হইতেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য !

জাত-বিপ্লবী বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলী

এই সময়ে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ছদ্মবেশে পথে-পথে ঘুরিতেন। তিনি খাকি প্যাণ্টকোট পরিয়া সাইকেলযোগে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। কোন বিশিষ্ট আশ্রয়ে তিনি বড় থাকিতেন না। ঘুরিতে-ঘুরিতে কোনদিন আমাদের নিকটে আসিতেন এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া সাইকেলযোগে আবার পথে বাহির হইতেন। তাঁহার ন্যায় অক্লান্তকর্ম্মী জাত-বিপ্লবী খুব কমই দেখিয়াছি। তিনি শুধুই নিরলস ছিলেন না, তাঁহার কর্ম্মশক্তিও ছিল অসাধারণ। তাঁহার চিত্তের দৃঢ়তা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইতাম।

বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলীর সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয় কলিকাতায় অরুণচন্দ্রের বাসায়। তিনি "আত্মোন্নতি সমিতির" একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। অরুণচন্দ্র কলেজে পড়ার কালে "আত্মোন্নতি সমিতির"ই এক কেন্দ্রে স্থান লওয়ায়, বাহিরের বিপ্লব-তরঙ্গে সে যাহাতে ভাসিয়া না যায়, এইজন্য তাহাকে সতর্ক রাখার উদ্দেশ্যে মাঝে-মাঝে তাহার

বাসায় গিয়া আমি উপস্থিত হইতাম। সেইখানে বিপিনচন্দ্রও আসিতেন। তাঁহার সহিত কথা কহিয়া বুঝিয়াছি—স্বাধীনতার কি কঠোর সঙ্কল্প লইয়া তিনি কর্ম্ম করিতেন। বিপ্লব-সাধনায় তিনি সম্পূর্ণরূপেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। রডা কোম্পানীর মজার-গুলী যতীন্দ্রনাথ প্রমুখের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনিই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই মজার-পিস্তল কার্ত্তুজের অভাবে অচল হইয়াই থাকিত। কার্ত্তুজগুলি উদ্ধার করার প্রচেষ্টার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেই পিস্তল ও কার্ত্তুজ বিপিনচন্দ্র বাংলার সর্ব্ব-কেন্দ্রে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাহার মধ্য দিয়া চন্দননগরের সহিত সারা বাংলার বিপ্লব-সমিতির সংযোগসূত্রও দৃঢ় হইয়াছিল। বিপিন চন্দ্রেরই নেতৃত্বে ১লা জানুয়ারী ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বিক্রমপুরে ডাকাতির প্রচেষ্টা হয়। তরুণ বিপ্লবীরা সকলেই প্রায় কলিকাতাবাসী। বিক্রমপুরে তাহারা অনেক অসুবিধায় পড়ে ও ডাকাতি করা দূরে থাক, পুলিসের হস্তে তাহারা অগ্রেই বন্দী হয়। প্রায় ৭ জন তরুণ পুলিসে মুচলেকা দিয়া মুক্তি পায়। বিপিনচন্দ্র কর্ম্মীদের এইরূপ আচরণে পরিতুষ্ট হইতে পারেন নাই।

চন্দননগরে গুপ্ত বিপ্লব-দুর্গ

যখন বাংলার নামজাদা বহু বিপ্লবী চন্দননগরে আসিয়া আশ্রয় লইতেছেন, সেই সময়ে ভারতের বডলাট বাহাদুর কলিকাতা-পরিদর্শনে আগমন করেন। কলিকাতায় বিপ্লবী বলিয়া যে সকল তরুণ তখন পুলিসের নিকট চিহ্নিত ছিল, সেই সময়ে তাহাদের অনেককেই পুলিস-হাজতে আটক করা হয়। অরুণ তখন কলিকাতায় রিপণ কলেজে বি-এ পড়িতেছিল, তাহাকেও বাসা হইতে ধৃত করিয়া লালবাজারে বন্দী করা হয়। উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। পুলিসের ধরপাকড ক্রমেই বাড়িতে থাকে। এই সময়ে আমার বাড়ী নিরাপদ্ আশ্রয় বলিয়া মনে না হওয়ায়, ইতঃপূর্ব্বেই

আমি অরুণচন্দ্র মারফৎ তাহার বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ শেঠের সহিত পরামর্শ করিয়া যোগেন্দ্রবাবুর শ্বশুর ধনী রূপলাল নন্দী মহাশয়ের গালাকুঠি নামক প্রাচীন ভগ্ন প্রাসাদে বহু ছদ্মবেশী বিপ্লবীদের আশ্রয় করিয়া দিয়াছিলাম। তখন রূপলালবাবুর বাড়ীটীর পুনর্নির্ম্মাণ চলিতেছিল। বিপ্লবীরা কেহ গোমস্তা, কেহ সরকার, কেহ-বা ওভারশীয়াররূপে এই বৃহৎ বাটীর একাংশে বাস করিতেন এবং তাঁহাদের বহু সুহৃৎ, বন্ধু, পরিজনাদি মধ্যে-মধ্যে আসেন—এই অজুহাতে পুলিসের সন্দেহ এড়াইয়া চলিতেন। রাত্রে গা ঢাকা দিয়া দুই-একজন বিপ্লব-নেতা আমার সহিত দেখা করিতে আসিতেন। বিপ্লবীদের সর্ব্ববিধ কর্ম্মব্যবস্থার পরামর্শ আমার বাড়ীতেই হইত। এমনই ভাবে যেন বিপ্লবের গুপ্তদুর্গ রচনা করিয়া সদা উদ্বেগপূর্ণ সতর্কতার মধ্যে আমাদের তখন দিন কাটিতেছিল।

বিপত্তির বেড়াজালে

হঠাৎ একদিন আমার সহচর সাগরকালী ঘোষকে ধরিবার জন্য পুলিস তাঁহার কর্ম্মস্থলে উপস্থিত হওয়ায় তিনি অন্য পথে নিজের নৌকায় চলিয়া আসিয়া নৌকা ছাড়িয়া দেন। ইত্যবসরে পুলিস দলবল সহ গঙ্গাতীরে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন সাগরকালী বাবুর নৌকা অর্দ্ধ গঙ্গা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। পুলিসেরা দেখিল—এখন অনুসরণ করিলেও, সাগর-কালীবাবু অগ্রেই চন্দনগরের তীরে গিয়া উঠিবেন। ফরাসী চন্দননগরের উপর বৃটিশ পুলিসদের তখন বিশেষ শক্তি নাই। তাহারা নিরাশ হইয়া গঙ্গার অপর তীরে দাঁড়াইয়া কালীবাবুর নৌকা লক্ষ্য করিলেন মাত্র।

এদিকে অরুণচন্দ্র দত্তের বন্দী হওয়ার সংবাদে আমার অন্যান্য কয়েক জন বন্ধুর কলিকাতায় যাওয়া বন্ধ হইল। আমি তখন সবেমাত্র স্বাবলম্বনের সাধনায় সাগরকালীবাবু ও আর দুইজন তরুণ ছাত্রকে লইয়া চেয়ারের কারখানা খুলিয়াছি। নিজেদের জীবন-যাপনের

ব্যবস্থা করার জন্যই এই নূতন স্থষ্টিটুকুর স্থত্রপাত মাত্র এই সময়ে হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র ব্যবসায়টীই পরে কালীবাবু প্রমুখ আমার বন্ধুদের জীবন নির্ভর করার আশ্রয় হইয়াছিল। উহা পরিচালিত করার জন্য তরুণ কর্ম্মী মাণিকলাল রক্ষিতই বিশেষভাবে সর্ব্বপ্রকার দায়িত্বের বোঝা মাথায় লইয়াছিল। সেও একদিন শ্যামনগর ষ্টেশনে নামিয়াই লক্ষ্য করিল যে, পুলিস তাহার অনুসরণ করিতেছে। সে উর্দ্ধশ্বাসে শ্যামনগরের ঘাটে ছুটিয়া আসিয়া, সেখানে দেখে যে, পারের নৌকা গঙ্গাবক্ষে অনেকখানি দূরে চলিয়াছে চন্দননগরেরই অভিমুখে। তখন সে গঙ্গার বক্ষে ঝাঁপ দিয়া সেই নৌকাখানিতে আশ্রয় লয় এবং পরে আমার নিকট আসিয়া সমস্ত ঘটনাটী বর্ণনা করে। পূর্ব্বে কেবল নিজের জীবিকার কথাই ভাবিতাম। নূতন চেয়ারের কারখানাটী খুলিয়া ভাবিয়াছিলাম যে, ক্ষুদ্র সজ্যসংসারের জীবিকার্জ্জনের একটা ব্যবস্থা হইল। কিন্তু বিধাতা এইদিকে প্রথমেই গুরুতর বাধা স্থষ্টি করিয়া, আমাদের শক্তি-পরীক্ষা করিতেই বুঝি চাহিলেন। কাঠের কাজে কলিকাতায় যাতায়াত মাণিকলালই করিতেছিল। এই ঘটনার পরে তাহাকেও বসিয়া পড়িতে হওয়ায়, বিপত্তির বেড়াজালে আমায় খুব বিপন্ন হইতে হইল। সর্ব্বতোভাবে নিরুপায় হইলে, তৃতীয় শক্তির সহায়তা কেমন করিয়া মিলে, সেই অসহায় অবস্থায় তাহা আমি ভাল করিয়াই বুঝিয়াছি। এই জন্য আজ স্বাবলম্বনের সাধনায় বাধায় নিরস্ত হইতে সকলকেই আমি বারণ করি। বাংলার প্রত্যেক তরুণ সর্ব্ব বাধা জয় করিয়া স্বাবলম্বী হউক, এই ইচ্ছাই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে পোষণ করি।

অরুণচন্দ্র অবশ্য এক সপ্তাহ পরে চন্দননগরে ফিরিল। বুঝিলাম—সাময়িকভাবেই বহু সন্দেহভাজন বিপ্লবীর সহিত তাহাকেও হাজতে রাখা হইয়াছিল। কিন্তু অরুণচন্দ্রেরও ইহার পর চন্দননগরের বাহিরে যাওয়া আমার শ্রেয়ঃ মনে হইল না। আমার তরুণ কর্ম্মিগণ এইরূপে একে-

একে প্রায় সকলেই চন্দননগরে আটক হইয়া পড়িল। এই সকল তরুণ কর্ম্মীদের বিপ্লবের কাজে আমি খুব কমই নিযুক্ত হইতে দিতাম। আমার স্বপ্ন ছিল—জাতি গড়া। ইহাদের সেই সংগঠনী কর্ম্মের উপযোগী করিয়াই আমি বিশেষভাবে গড়িয়া তুলিতেছিলাম। গঠন-যজ্ঞে এই সকল তরুণ যাহাতে উপযুক্ত চরিত্র লইয়া আগাইতে পারে, সেই চিন্তাই আমি করিতাম। ইহাদের শিক্ষা ও কর্ম্মপথ রাজশক্তির কোপে কণ্টকিত হইয়া এক্ষণে ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া তুলিল।

অনর্থের সীমা রহিল না। আমার তরুণ ছাত্রদের এমনই নজর-বন্দী অবস্থায় তাহাদের অভিভাবকদের নিদারুণ ব্যথা ও অসন্তোষ লক্ষ্য করিয়া যেমন একদিকে আমি মর্ম্মপীড়িত হইতাম, তেমনি অপর দিকে আমার প্রবীণ সহকারী সাগরকালী ঘোষ, সত্যচরণ কর্ম্মকার প্রভৃতিও আটক পড়িয়া কর্ম্মশূন্য ও উপার্জ্জনশূন্য হওয়ায়, তাহাদের পারিবারিক জীবনযাত্রার জন্যও বিশেষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়াছিলাম। ইহাদের মাসিক সংসার-খরচের জন্য আমি তখন সম্পূর্ণরূপে এই ক্ষুদ্র ব্যবসায়টীরই উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইলাম। ইহার পরেই আবার নির্ম্মলচন্দ্র বক্সীও এই একই অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে একদিন সে আসিয়া আমায় জানাইল যে, চাকুরী হইতে তাহাকেও চিরবিদায় লইতে হইয়াছে। মিলের কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে চাকুরী ছাড়িতে বাধ্য করিয়াছেন। সাহেবেরা নির্ম্মলচন্দ্রের উপর স্বদেশপ্রেমিক ও সম্ভবতঃ বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিশীল বলিয়া সন্দেহপরায়ণ হইয়াও, তাহাকে এতদিন কর্ম্মচ্যুত করিতে পারেন নাই। এবার একটা ঘটনার সূত্র ধরিয়া উক্ত কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত নির্ম্মলচন্দ্রের বচসা হয়। নির্ম্মলচন্দ্র চিরদিনই কর্ত্তব্যপরায়ণ ও স্পষ্টবক্তা ছিল। বড়বাবু হিসাবে মিলের মেল-ব্যাগ সর্ব্বপ্রথমে সে-ই খুলিত। একদিন মেল আসিতে বিলম্ব হওয়ায়, নির্ম্মলচন্দ্র যথাসময়ে বাসায় চলিয়া যায়। এই ঘটনা

লইয়া সাহেবদের সহিত তাহার কথা-কাটাকাটি হয়। সাহেবেরাও চাহিতেচিলেন নির্ম্মলচন্দ্রের বিদায়। এই ঘটনায় সে বিদায় লইয়াছে। নির্ম্মলচন্দ্র চাকুরী ছাড়িয়া চন্দননগরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

নির্ম্মলচন্দ্র বক্সী সংহতির কর্ম্মে ও কর্ম্মসংস্থানে আমার দক্ষিণ-হস্ত স্বরূপ ছিল। বরিশালের বিপ্লব-সমিতির সহিত সে-ই সংযোগ রক্ষা করিত। তাহার মধ্য দিয়াই আমি উক্ত বিপ্লবীদের বহু কর্ম্মে সহায়তা করিতাম—প্রয়োজন-মত পরামর্শও দিতাম। নির্ম্মলচন্দ্র সাউথ ইণ্ডিয়ান জুট মিলে থাকায়, আমি তাহার নিকট "অনুশীলন সমিতির" বিপ্লবীদের আশ্রয়ের ব্যবস্থাও করিয়া দিতাম। নির্ম্মলচন্দ্রই পুলিসের ডেপুটী সুপারিণ্টেডেণ্ট বসন্তবাবুর হত্যা-প্রচেষ্টায় আহত তরুণ আনন্দকে তাহার নিকট রাখিয়া নিরাময় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। খুব সম্ভবতঃ এই সকল সংবাদ মিল-কর্ত্তৃপক্ষগণ জানিতে পারিয়াছিলেন। বিশেষতঃ এই মিলেরই হপ্তা দিবার কয়েক সহস্র মুদ্রা গার্ডেন রীচের ডাকাতিতে যখন লুণ্ঠিত হইল, তখন কর্ত্তৃপক্ষ সন্দেহভাজন ব্যক্তির উপর আর মিলের কর্ত্তৃত্বভার রাখিয়া নিশ্চিন্ত রহিতে পারিলেন না। তাঁহারা তাহাকে এক-প্রকারে বরখাস্তই করিলেন। চাকুরী হইতে মুক্তি পাইল নির্ম্মলচন্দ্র ; কিন্তু ভাবনা আমার বাড়িল বৈ কমিল না। নির্ম্মলের চারি জন অনুজ, দুই জন ভগ্নী এবং বিধবা মাতাকে লইয়া একটি বৃহৎ পরিবারের ভরণপোষণ-ভারও আমার স্কন্ধে আসিযা পড়িল। উপরন্তু বিপ্লব-কর্ম্মেও আমার আর্থিক বোঝা ক্রমেই ভারী হয়। বহু তরুণ ও প্রবীণ বন্ধুদের জীবনযাপনের ব্যবস্থা আমারই উপর নির্ভর করে বুঝিয়া নির্ম্মলচন্দ্র এতদিন প্রতি মাসে শত মুদ্রা আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া আসিতেছিল। নির্ম্মলচন্দ্র আমারই আদর্শে নিবেদিত মানুষ। অতএব তাহার প্রদত্ত এই টাকা লইতে আমার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা ছিল না। হঠাৎ তাহার চাকুরী যাওয়ায়, আমার চিন্তার ভার বিশেষ গুরুতর আকার ধারণ করিল।

অন্ধকারে আলো—ভবিষ্যতের সূচনা

এই সময় হইতেই কিন্তু অন্তরের গভীরে আমি ভবিষ্যৎ-সৃষ্টির আভাস পাইতে লাগিলাম। মাঝে-মাঝে মনে হইত—বিদ্রোহ সৃষ্টি করিয়া ভারতের স্বাধীনতা মিলিবে না। বিধাতা এই জন্য যেন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। ইহা আমার কল্পনা মনে করিয়া, আবার তাহা হইতে আমি যথাসম্ভব দূরেই থাকিতে চেষ্টা করিতাম। বিপ্লবকর্ম্মে আমার ত্রুটি অথবা ঔদাসীন্য ছিল না। কিন্তু নির্ম্মলচন্দ্রের কর্ম্মচ্যুতির পর তাহাকেই অবলম্বন করিযা আমার কল্পনা রূপ লওয়ার পথ সৃষ্টি করিল। এই সময়ে হাওড়ার কয়েক জন কিশোরকে নির্ম্মলচন্দ্র মিলে কাজ দিয়া শিক্ষা ও দৃষ্টান্তে তাহাদের নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতেছিল। আমি তাহার মধ্য দিয়া এই মানুষ গড়ার কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠারই অতঃপর নির্দ্দেশ প্রদান করিলাম। বিনা দ্বিধায় আমার নির্দ্দেশকে মাথায় করিযা, সে হাওড়া জেলার ডোমজুড় থানার অন্তর্গত দফরপুর গ্রামে, সত্যচরণ ঘোষের বাড়ীতে আসন পাতিয়া, এই সংগঠন-কর্ম্মেই ব্রতী হইল।

সন্ত্রাসবাদের জের—খুন ও ডাকাতি

২২শে জানুয়ারী তারিখে দুইটী ডাকাতির প্রচেষ্টা হয়। ডাকাতির টাকা বিপ্লবের কাজে নিয়োগ করার প্রতিশ্রুতি ছিল তরুণদের। কিন্তু সেই টাকা বহু গৃহস্থ পরিবারের নিকট রাখা হইত। অনেক সময়ে বিপ্লবকর্ম্মে ব্যয়িত না করিয়া, সুযোগ-মত এই সকল গৃহীরাই সেই বহু-কষ্টার্জ্জিত অর্থ নিজেদের জন্য ব্যয় করিত। এইরূপ সংবাদ আমরা পাইতাম। যাহারা এইরূপ কর্ম্ম করে, তাহাদের সমুচিত দণ্ড দিবার জন্য নির্দ্দেশ ছিল। অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ স্বার্থপর গৃহীরা উপযুক্ত শাস্তিও লাভ করিত।

ঢাকা জিলার কলমরিদা ডাকাতি করিতে গিয়া কর্ম্মীরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ

হইয়া ফিরিয়া আসে। গৃহস্থের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া লোহার সিন্দুক ভগ্ন করিতে তাহারা অসমর্থ হয়। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাদের বিফলমনোরথ হইতে হয়। ঐ রাত্রেই বাঘমারা ডাকাতিতে ৪ হাজার টাকা বিপ্লবীরা হস্তগত করে।

ইহার পর ২৩শে জানুয়ারী রংপুরের অন্তর্গত কুরুল গ্রামে জনৈক ব্যবসাদারের গৃহে ডাকাতি করিযা প্রায় ৫০ হাজার টাকা হস্তগত হয়। এই টাকায় বাংলার বিপ্লব-কর্ম্ম অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল।

এই যুগে দেশব্যাপী ডাকাতি করিয়া অর্থ-সংগ্রহের প্রচেষ্টা যেমন প্রবল হয়, তেমনই পুলিস-কর্ম্মচারী ও তাহাদের অনুচরগণকে নিহত করার প্রয়াসও এই সময়ে চরমে গিয়া পৌঁছায়। বাংলার তরুণ বিপ্লবীরা ভারতব্যাপী বিদ্রোহ-সৃষ্টির পথ রুদ্ধ হওয়ায়, এক প্রকার ক্ষিপ্ত হইয়াই সন্ত্রাসবাদের মধ্য দিয়া দেশের শাসনচক্রকে চূর্ণ করার আয়াস করিয়াছিল। পুলিস-ইন্স্পেক্টর নন্দকুমার বসু বিপ্লবীদের সন্ধান করার জন্য অতি উৎসাহে কর্ম্মরত ছিলেন। তাঁহাকে হত্যা করার জন্য তাঁহার নিজ বাড়ীতেই সশস্ত্র বিপ্লবীরা প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। নন্দকুমার বসু সে যাত্রা রক্ষা পান। কিন্তু তাঁহার শরীররক্ষক বিপ্লবীদের গুলীর আঘাতে নিহত হয়। একজন ভৃত্যও গুলী খাইয়া উত্থানশক্তি-রহিত হইয়াছিল। বিপ্লবীদের ধরিবার সাহস তাহারা কেহ করে নাই।

এই সময়ে নাটোরে এক ভীষণ ডাকাতির সংবাদ প্রকাশ পায়। ৩০।৪০ জন বিপ্লবী সংহতিবদ্ধভাবে মজার পিস্তল হাতে এক ধনীর গৃহে হানা দেয়। সেই ডাকাতিতে প্রায় ২৫ হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়।

বাংলার বিপ্লবীরা দেশদ্রোহীদের সায়েস্তা করার জন্যও এই সময়ে কিরূপ উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা কুমিল্লার প্রধান শিক্ষক শরৎকুমার বসুর হত্যার সংবাদে দেশদ্রোহীরা বুঝিতে পারে। ইহাদের রক্ষা করার শক্তি ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের নাই, তাহা ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠে।

বাংলার প্রতি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকেরা এই ঘটনায় সতর্ক হইয়া ছাত্রদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতেন। স্বদেশীর নাম শুনিলে তাঁহারা তরুণদের ভয়ের চক্ষেই দেখিতেন। শরৎবাবুকে রক্ষা করিতে আসিয়া এক ভৃত্যও নিহত হয়। কয়েক জন মুসলমান হত্যাকারীকে অনুসরণ করিতে গিয়া গুলীর আঘাতে আহত হন। হত্যাকারী এই ক্ষেত্রে নিরাপদেই প্রস্থান করিয়াছিল।

পূর্ব্ববঙ্গে বিপ্লবীদের উদ্বুদ্ধতা চরম সীমায় উঠিয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গও বিপ্লব-রঙ্গে এই সময়ে মাতিয়া উঠে। বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলী এই বিষয়ে একজন অগ্রণী ছিলেন। ২৪ পরগণায় আড়িয়াদহের ডাকাতি তাঁহারই পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই বৎসরের আগষ্ট মাসে আগড়-পাড়ার ডাকাতি করিতে গিয়া তিনি পুলিসের হাতে ধরা পড়েন।

অর্থ সংগ্রহ করিয়া এক ব্যক্তি ফিরিতেছিল, বিপিনবাবুর দলের লোক সেই অর্থ তাহার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লওয়ার সময়েই অদূরে অবস্থিত সশস্ত্র দলনেতা বিপিনচন্দ্রকেও পুলিস ধৃত করে। বিপিনবাবুকে হারাইয়াও বিপ্লবীরা নিরাশ হইল না। তাহারা অধিক উদ্যমে কর্ম্মরত হইল।

সুশীলকুমার

তরুণ সুশীল সেনের কথাও মনে উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া রহিয়াছে। বালক সুশীলকুমারকে কিংস্‌ফোর্ড সাহেব বেত্রঘাতের দণ্ড দিয়াছিলেন। সুশীল চন্দননগর বিপ্লবকেন্দ্রে বহুবার আসিয়াছে। বরিশাল বিপ্লব-সংহতির সহিত সংযুক্ত হইয়া সে নদীয়া জেলার প্রাগপুরে ডাকাতি করিতে যায়। সেই ভীষণ ডাকাতির সংবাদ আগুনের ন্যায় সারা সহরে প্রচারিত হইলে, গ্রামবাসী পুলিসের সহিত নৌকারোহণে পলায়নোদ্যত বিপ্লবীদের অনুসরণ করে। নৌকা হইতে মজার পিস্তলে পুলিস ও

গ্রামবাসীদের প্রতি গুলী করা হয়। পুলিসও গুলী চালায়। ভুলক্রমে বিপ্লবীর গুলীতেই সুশীল আহত হয়। শেষ মুহূর্ত্তে অবস্থা গুরুতর হওয়ায়, তার গুলীবিদ্ধ দেহ নদীর বুকেই বিসর্জ্জন দিতে হয়। পলায়নের পথ রুদ্ধ হওয়ায়, নৌকা ডুবাইয়া বিপ্লবীরা ইতস্ততঃ পলাইয়া যায়। সুশীলের ন্যায় বিপ্লবীকে এমনভাবে হারাইয়া আমরা অতিশয় মর্ম্মন্তুদ বেদনাই পাইয়াছিলাম।

ঘটনার প্রবাহ

তারপরই শিবপুর ডাকাতির কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

বরিশালের বিপ্লব-সমিতি এই ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। এক সশস্ত্র বিপ্লবী দল নৌকারোহণে শিবপুরে কোন ধনী কারবারীর গৃহে হানা দেয়। তাহারা নৌকাযোগে প্রস্থানের উদ্যোগ করিলে, পুলিস সহ গ্রামবাসীরা তাহাদের অনুসরণ করে। উভয় পক্ষেই গুলী চলে। তারপর বিপ্লবীরা পরাস্ত হইয়া আত্মসমর্পণ করে। প্রায় ২০ জন বিপ্লবী এই ডাকাতিতে যোগদান করিয়াছিল। তন্মধ্যে ৯ জনকে নৌকায় পাওয়া যায়। বিচারে তাহাদের কারাদণ্ড হয়।

ইহার পর হরিপুরের ডাকাতির সংবাদ পাওয়া যায়। বিপ্লবীরা ১৮,০০০, টাকা লইয়া প্রস্থান করে। কেহ তাহাদের অনুসরণ করিতে পারে নাই। বাড়ীর দ্বারবান্ গ্রামবাসীদের সহিত কয়েক পা অগ্রসর হইতে গিয়াই মজারের গুলীতে নিহত হয়। অতঃপর গ্রামের লোকেরা বিপ্লবী দলের অনুসরণে আর সাহসী হয় না।

বুড়ীবালামের তীরে—প্রথম সম্মুখ-যুদ্ধ

জার্ম্মাণীর সহিত ভারতের ষড়যন্ত্রেয় কথা প্রকশিত হইলে, পুলিস তাহারই তদন্তমুখে যতীন্দ্রনাথের সংবাদ পায়। এই সময়ে যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বরে বুড়ীবালামের তীরে ৪ জন তরুণসহ এক কৃষকের

ঘরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। বালেশ্বরের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট যতীন্দ্রনাথের সংবাদ পাইয়া, সদলবলে এই কৃষকের বাড়ীটী ঘিরিয়া ফেলেন। যতীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গীদের লইয়া ময়ূরভঞ্জের অরণ্যে প্রবেশ করেন। পুলিসের দল তাঁহাদের অনুসরণ করায়, সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। চিত্তপ্রিয় পুলিসের গুলীতে নিহত হইলে, যতীন্দ্রনাথ প্রমুখ শেষ পর্য্যন্ত পুলিসের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু পরিশেষে তিনিও গুলীর আঘাতে আহত হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়েন। তিনি সঙ্গীদের অতঃপর যুদ্ধ বন্ধ করিতে আদেশ দেন। পুলিস অতি উৎসাহে যতীন্দ্রনাথকে ধৃত করিতে গিয়া দেখে যে, তিনি গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন। পুলিস-ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠাইবার কালেই তাঁহার মৃত্যু হয়। বাংলার বীর সন্তান সর্ব্বপ্রথম সম্মুখসমরে আত্মাহুতি দিয়া বিপ্লবীদের চিরস্মরণীয় হন। অপর তিন জন ধৃত তরুণদের মধ্যে নীরেন ও মনোরঞ্জনের ফাঁসী ও রুগ্ন যতীশের যাবজ্জীবন দণ্ডাদেশ হয়।

বালেশ্বরের এই খণ্ডযুদ্ধ স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম সম্মুখ-যুদ্ধরূপে ইতিহাসে চিরপ্রখ্যাত হইয়া থাকিবে।

অর্থের দায়ে

অর্থের প্রয়োজন প্রতি পদেই বিপ্লবীদের ছিল। এই হেতু স্থির হইয়া বিপ্লবের কাজে তাহারা আত্মনিয়োগ করিতে পারে নাই। স্বাধীনতার অগ্রপুরোহিতগণ দস্যুবৃত্তি করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, সেই অর্থের বহু অপচয়ও আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু প্রতিকারের উপায় সম্ভবপর হয় নাই।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ধনিকদের দুয়ার এক প্রকার বন্ধ হওয়ায় অথবা তাহারা বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করায়, বিপ্লবিগণ সাধারণ দোকানপাট লুট করিতে প্রবৃত্ত হন। রাহাজানি করিয়াও তাহারা অর্থ-সংগ্রহের প্রচেষ্টা

করে। বহু বিপ্লবী এই সময়ে পলাতকরূপে ইতস্ততঃ বাস করিতেছিল। তাহাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব বিপ্লবী সংহতিকেই বহন করিতে হয়। ময়মনসিংহের চন্দ্রকোণার দোকান লুট করিয়া ২১০০০৲ টাকা সংগৃহীত হয়। ত্রিপুরার করতোয়া বাজারের অনেকগুলি দোকান লুট করিয়া ১৫০০০৲ টাকা পাওয়া যায়। টাকার অভাবে বহু বিপ্লবী অসহায়ের মত দুই বেলা উদর-পূরণেও সমর্থ হয় নাই। ভারতের স্বাধীনতার জন্য বাংলার বিপ্লবীদের কি কঠোর তপস্যা করিতে হইয়াছে, তাহা অবর্ণনীয়। মানুষ ধনসম্পদ্ বিপ্লবীদের ভয়ে যখন সতর্ক প্রহরায় রাখিত, তখন যে কোন উপায়ে বিপ্লবীরা অর্থ-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়। কি ব্যথা, কি আকুলতা লইয়া তাহাদের এইরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল, তাহা আজিকার স্বাধীন ভারতের মানুষ সহজে হয়ত বুঝিবেন না। বাংলার বিপ্লবীদের সেদিনের দুঃখ ভাষায় ব্যক্ত হইবার নহে।

আমাদের বেশ মনে পড়ে—ঘোড়দৌড়ের মাঠে খেলা দেখিয়া একদল বুক-বাইণ্ডার যখন ঘরে ফিরিতেছিল, তাহারা বাজী জিতিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে, এই ধারণায় একদল স্বাধীনতাকামী তাহাদের অনুসরণ করে। তাহারা যখন গৃহ-মধ্যে সুখোপবিষ্ট, তখন তরুণ বিপ্লবীরা তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। অনেক ধস্তাধস্তির পর বিপ্লবী দল নিরাপদে পলাইয়া আসে এবং সংগৃহীত অর্থ গণনা করিয়া দেখে ৭৫০৲ টাকা মাত্র তাহারা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এত বিপদের মধ্যে এই প্রকার অকিঞ্চিৎকর অর্থ-সংগ্রহ অনেকের মনে নৈরাশ্যের সঞ্চার করিত।

অর্থ যেমন সঙ্কটপূর্ণ অবস্থায় বিপ্লবীদের সঞ্চয় করিতে হইত, তেমনই পথের বাধাস্বরূপ আততায়ীর নিধনেও তাহাদের পশ্চাৎপদ হইলে চলিত না। সুবিধা পাইলেই পুলিস কর্ম্মচারীদের সহিত তাহাদের অনুচরবর্গকেও নিহত করার প্রচেষ্টা অবিরত চলিয়াছিল।

ময়মনসিংহে ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যতীন্দ্রমোহন ঘোষ নিজ বাড়ীর দরজায় বসিয়া তাঁহার শিশুপুত্রকে আদর করিতেছিলেন। তখন একদল বিপ্লবী তাঁহাকে গুলী করিয়া হত্যা করে। অপ্রত্যাশিত ভাবে শিশুটীও গুলীর আঘাতে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়।

বাজিতপুরের বিপ্লবীদের দল হইতে পৃথক্ হইয়া ধীরেন বিশ্বাস নিরাপদ্ জীবনযাত্রা করিতে অভিলাষ করিয়াছিল। সশেরদীঘীতে তাহাকে মজার পিস্তলের আঘাতে হত্যা করা হয়। শশী চক্রবর্ত্তী নামে আর একটী যুবকও বিশ্বাসঘাতক বলিয়া বিবেচিত হইলে, তাহাকেও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে "অনুশীলন সমিতি"র একজন প্রধান কর্ণধার অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী পুলিসের হস্তে ধৃত হন। ইনি তদানীন্তন ঢাকা বিপ্লবীদলের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। তিনি ধৃত হইলেও, "অনুশীলন সমিতির" কর্ম্মোদ্যম কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই।

ভারতব্যাপী বিদ্রোহ-সৃষ্টির পরিকল্পনায় বহু তরুণ গৃহত্যাগ করে। তাহারা বাংলার সর্ব্বত্র বিপ্লবের বীজ ছড়াইতেছিল। ভারতে স্বাধীনতার ধ্বজা উড়াইবার জন্যই দেশের একদল তরুণ আত্মদানে 'মরিয়া' হইয়াছিল। কলিকাতার সার্পেণ্টাইন লেনের এক বাড়ীতে এইরূপ কয়েক জন বিপ্লবীর সন্ধান পাইয়া পুলিস বাড়ী ঘেরাও করে। বিপ্লবীরা নির্ভীক চিত্তে প্রহরারত পুলিসের উপর মজারের গুলী বর্ষণ করিয়া অন্তর্হিত হয়। তাহাদের নিক্ষিপ্ত গুলীর আঘাতে স্থানীয় একজন রসুইকর মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

সতীশ ব্যানার্জীকে হত্যার প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়। সতীশবাবু বাড়ীর মধ্যেই ছিলেন। কয়েক জন বিপ্লবী মজার পিস্তল হস্তে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া গৃহকর্ত্তার উপর গুলী ছোঁড়ে। তিনি সে যাত্রা পরিত্রাণ লাভ করেন। বিপ্লবীরা ব্যর্থমনোরথ হইয়া নিরাপদেই কিন্তু গৃহ ত্যাগ করে।

বিপ্লবমূলক এই সকল কর্ম্মে দেশবাসীর মনে উত্তেজনার সৃষ্টি হইত, কিন্তু স্বাধীনতাকামী হইয়া জাতি কোনরূপ সাহায্য দিতে অগ্রসর হয় নাই। অর্থ এবং আশ্রয় সব দিক্ দিয়াই বিপ্লবীদের দুয়ার বন্ধ ছিল। তবে শুধু অর্থের দায়ই নয়, ডাকাতি ও রাজপুরুষ-হত্যা—উভয় কর্ম্মের মধ্য দিয়া বাংলার তরুণদলের একটা দুঃসাহসিক বীরজাতিরূপে গড়িয়া তোলারও যে অনুপ্রেরণা নেতৃগণের মনে কার্য্য করিয়াছিল, ইহাও আমায় বলিতে হইবে। নতুবা বিপ্লববাদের ভিত্তিপ্রস্তুতিস্বরূপে সে যুগের এই সন্ত্রাসবাদের পর্য্যায়টীর সম্যক্ ব্যাখ্যা দরদী ঐতিহাসিকের নিকট অপরিস্ফুটই রহিয়া যাইবে। সে যুগের বিপ্লবকাহিনী অসংখ্য করুণ ও রোমাঞ্চকর ঘটনায় পূর্ণ।

শেষ অধ্যায়

বাংলায় বিপ্লব-সৃষ্টির জন্য যাহারা গৃহত্যাগ করিয়াছিল, তাহারা অনেকেই গৃহে আর পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিল না। বাংলার প্রসিদ্ধ বিপ্লবিগণ এই সময়ে আমারই আশ্রয়ে বাস করিতেন। ঢাকার "অনুশীলন সমিতির" সহিত আমার সম্বন্ধ নিবিড়তর থাকায়, রাসবিহারীর প্রস্থানের পর সমিতির কর্ণধার বলিয়া আমার নিকট এক ব্যক্তি প্রেরিত হইল। তাহার চালচলন দেখিয়া তাহাকে বিপ্লবধর্ম্মী বলিয়া আমার ধারণা হইল না। আমি দেখিলাম—তাহার আঙ্গুলে বহুমূল্য অঙ্গুরীয়। তাহার বেশভূষার পারিপাট্যও সমধিক। এই সকল কারণে ইহাকে আমি বিপ্লবী বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে পারি নাই। কিন্তু যখন অন্যান্য নেতা তাহাকে আমার নিকট প্রেরণ করিলেন, তখন অন্তরঙ্গ হিসাবে তাহাকে গ্রহণ করা ছাড়া আমার আর গত্যন্তর ছিল না।

এই সময়ে বিপ্লবীদের আমার বাড়ীতে স্থান দেওয়া সম্ভবপর ছিল না। এইজন্যই রূপলাল নন্দীর গালাকুঠীতে অমরেন্দ্রনাথ প্রমুখ

পশ্চিমবঙ্গের বহু বিপ্লবীদের স্থান করিয়া দিয়াছিলাম। এই ব্যক্তিকে সেখানে রাখার ব্যবস্থা করা আমার কেমন মনঃপুত হইল না। আমি তাহাকে গোপন রাখার জন্য আমার অনুরাগী ভক্ত বংশীধরকে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। বংশীধর ছিল বিহারবাসী। চন্দননগরের যে সকল গোলাদারী দোকান মাড়োয়ারীরা পরিচালন করিতেন, সেই সকল দোকানের পাকা খাতা রাখার কাজে সে নিযুক্ত ছিল। বিপ্লবের কর্ম্মে তাহার যথেষ্ট সহানুভূতি ও সহায়তা ছিল। বংশীধরকে গোয়েন্দা পুলিস সংশয়ের চক্ষে দেখিত না। এইজন্য বহু অস্ত্রশস্ত্র তাহার কাছেই আমি রাখিতাম। এই কর্ম্মের জন্যই তাহার স্ত্রীকে আনাইয়াছিলাম। বিপ্লবের কর্ম্মে সে ছিল পতির সহধর্ম্মিণী। যে বাসায় এই দম্পতি বাস করিত, নবাগত বিপ্লবীকে তথায় স্থান করিয়া দিলাম। উহার নাম কানাইলাল সাহা। "অনুশীলন সমিতির" কোন বিপ্লব-নেতার নিকট আমাদের কিছু গোপন করা চলিত না। অতএব কানাইলাল আমাদের সকল কথাই জানিত। এমন কি যে সকল স্থানে বোমা প্রস্তুত হইত, সেই সকল স্থানও তাহার অবিদিত ছিল না। এই ব্যক্তি ধরা পড়ার পর আমাদের ষড়যন্ত্রের কথা গোয়েন্দা পুলিসের নিকট প্রকাশিত হইয়া যায়; তাহারই ফলে চন্দননগরের বিপ্লব-কেন্দ্রগুলি মিষ্টার টেগার্ট সাহেবের তত্ত্বাবধানে খানাতল্লাসী হয়। এই সময়ে মঁসিয়ে পমেজ নামক ফরাসী পুলিস কমিশনার মিষ্টার টেগার্টের আগমন-সংবাদ পূর্ব্ব হইতে দেওয়ায়, আমরা সতর্কতা অবলম্বন করি। তাই খানাতল্লাসীতে কোন বস্তুই বাহির হয় নাই। গালাকুঠীতেও কাহাকেও পুলিস ধৃত করিতে পারে নাই।

ঘটনা সত্যই মর্ম্মন্তুদ ও বীভৎস!

একদিন মধ্য-রাত্রে সদর দ্বারে কড়া নাড়ার শব্দ শুনিয়া আমি ঘর হইতে বাহির হওয়া মাত্র, বংশীধর ও তাহার পত্নীকে উত্তেজিত হইয়া

উপস্থিত হইতে দেখি। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, উভয়েই চক্ষের জল ফেলিয়া যে বৃত্তান্ত প্রকাশ করিল, তাহাতে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। ভগবান্ এত পাপ কেমন করিয়া সহিবেন! এইরূপ চরিত্রের লোক বিপ্লবীদের আশ্রয়ে থাকিলে যে মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া আমাদের অভিযান, তাহা শীঘ্রই ব্যর্থ হইবে—এইরূপ নিশ্চয়তা মনে দৃঢ় হইল।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের পরেই "আর্য্য" পত্রিকা বাহির করার সঙ্গে-সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে অতঃপর এই "তান্ত্রিক" কর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু এই পর্য্যন্ত তাঁহার কথা শুনিতে পারি নাই। বাংলার বিপ্লব-সাধনা এই সময়ে অনেকখানি আমাকে কেন্দ্র করিয়া চলিতেছিল। বিশেষতঃ "অনুশীলন সমিতি"র আমিই তখন কার্য্যতঃ মূল পরিচালক। বিপ্লবের কর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া তাই আমার পক্ষে সহজ হয় নাই। কিন্তু বংশীধর ও তাহার পত্নীর নিকট সেদিন যে কথা শুনিলাম, তাহাতে শ্রীঅরবিন্দের কথা না শুনিয়া কেন বিপ্লবকর্ম্মে এখনও আত্ম-নিয়োগ করিয়া রহিয়াছি, তাহা ভাবিয়া বড় অনুতপ্ত হইলাম। বংশীধর হিন্দী ভাষায় জানাইল "বাপুজী, আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আপনার কথামত যে বিপ্লবীকে ঘরে ঠাই দিয়াছি, সেই ব্যক্তি সহসা আমার স্ত্রীর উপর ব্যভিচার করার চেষ্টা করিয়াছে। আমার স্ত্রী গর্ভবতী; তিনি কি কষ্টে এই অত্যাচারের হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়াছেন, তাহা আপনাকে কেমন করিয়া বুঝাইব! আমার স্ত্রী, নিজের মুখেই সকল কথা বলিবেন, তাই সঙ্গে আসিয়াছেন।" আমি বংশীধরের স্ত্রীর মুখ হইতে সকল কথাই শুনিলাম। তাহার অশ্রুসিক্ত নয়ন দেখিয়া আমিও কাঁদিয়া ফেলিলাম। এত বড় অত্যাচার কোন বিপ্লবী যে করিতে পারে, এই ধারণা আমি পূর্ব্বে করিতে পারি নাই। নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মিল। আমি বংশীধর ও তাহার

পত্নীকে কোনমতে সান্ত্বনা দিয়া গৃহে পাঠাইলাম। বলিলাম যে, কল্য প্রাতঃকালেই আমি ইহার জন্য কঠোর ব্যবস্থা করিব।

প্রাতঃকালেই কানাইলালকে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। সে অপরাধ স্বীকার করিল। তাহাকে হত্যা করার জন্য অনুরোধও জানাইল। আমি তাহাকে বলিলাম—এই মুহূর্ত্তে তাহাকে স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। সে কিছুক্ষণ অধোবদন থাকিয়া প্রস্থান করিল। তাহার পর এই দুরাচারের সহিত আমার আর সাক্ষাৎকার হয় নাই। বংশীধর তাহার স্ত্রীকে দেশে পাঠাইয়া দিল। একদিন সে আসিয়া জানাইল যে, তাহার স্ত্রীর গর্ভপাত হইয়াছে। আমি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি হইতে পারে, তাহা আজও ভাবিয়া পাই না!

আমার বৈপ্লবিক জীবনে যবনিকা পড়িল এই ঘটনায়। আমি দৃঢ় চিত্তে মুখ ফিরাইলাম—শ্রীঅরবিন্দেরই আদেশ-মত তন্ত্র হইতে বেদান্তে—রাষ্ট্রীয় বিপ্লব হইতে অধ্যাত্মভিত্তির উপর জাতির সংগঠনে। স্বাধীনতাকামীর মূল শক্তি চাই চরিত্রবল। ইহা ধর্ম্ম ও সংযমের উপরেই প্রতিষ্ঠা পাইবে। অধ্যাত্মযোগের সাধনায় এক দল শুদ্ধ-চরিত্র নারীপুরুষের জীবন যদি গড়িয়া তুলিতে পারি, তাহাদের প্রেম ও ঐক্যসিদ্ধ সংহতি বা সঙ্ঘত্বকে কেন্দ্র করিয়াই ভারতে নবীন জাতির অভ্যুত্থান হইবে—এই স্বপ্নেই আমি আজ উন্মাদ ও সর্ব্বত্যাগী।

অতুলচন্দ্র চন্দননগরেই থাকিত, সে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের শেষে আত্মগোপন করিয়াছিল। কিন্তু মাঝে-মাঝে কলিকাতায় গিয়া সে বিপ্লবীদের কাজে যোগ দিত। কয়েকটা ডাকাতির ব্যাপারে তাহার নাম বাহির হয়। তাঁহার সঙ্গে ছিল পুলিন মুখার্জী। পুলিনবাবু কোন ঘটনায় ধরা পড়িলে, অতুলচন্দ্র আর চন্দননগর হইতে বাহির হইত না।

"অনুশীলন সমিতি"র বৃহৎ সাফল্য—রায় বাহাদুর বসন্তকুমারের হত্যা। মুসলমানপাড়ায় তাঁহাকে বোমার আঘাতে নিহত করার প্রথম

চেষ্টা ব্যর্থ হয়, ইহা পুর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু ৩০শে জুন ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ভবানীপুরে তাঁহাকে হত্যা করা হয়। এই ঘটনার পর "অনুশীলন সমিতি"র কয়েক জন ধরা পড়ে। সম্ভবতঃ কানাইলাল সাহাও এই ঘটনায় ধৃত হয় ও স্বীকারোক্তি করে।

খানাতল্লাসী ও মিঃ টেগার্ট

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে চন্দননগরে ব্যাপক খানাতল্লাসী হয়—কানাইলাল সাহারই এই স্বীকারোক্তিতে। গোন্দলপাড়া হইতে বোড়াই-চণ্ডীতলা পর্য্যন্ত ব্যাপক খানাতল্লাসী হয়। আমার বাসাবাটীর চতুর্দ্দিকে পুলিস-প্রহরী রাখিয়া, সন্নিহিত অরুণচন্দ্র সোম ও মণীন্দ্রনাথ নায়েকের বাড়ীও বোমার সন্ধানে পুলিস হানা দেয়। সেখানে কিছু না পাইয়া, টেগার্ট সাহেব সহ ২৪ পরগণা ও হুগলী জেলার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এবং গোয়েন্দাবিভাগের তাৎকালীন ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডিক্সন সাহেব আমার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন আমাদের পরিচিত বন্ধু চন্দননগরের পুলিস কমিশনার পমেজ সাহেবও। বাড়ীখানি গোরা সৈনিক কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হয়। ফরাসী পুলিসও সেই সঙ্গে ছিল।

টেগার্ট সাহেব আমার সহিত বসিয়া অনেক কথা কহিতে লাগিলেন। ডিক্সন সাহেব অন্যান্য পুলিস কর্ম্মচারিগণ সহ আমাদের গৃহের আসবাবপত্র দেখিতে সুরু করিলেন। তাঁহার প্যাণ্টালুনে একটা তাপ্পি ছিল। রামেশ্বর দে তখন আমার বাড়ীতেই থাকিত। সে তাঁহাকে 'ব্যাণ্ডম্যান্' বলিয়া উপহাস করিল। তিনি সে কথা আমলে না আনিয়া, প্রতি ঘরের আসবাব-পত্র উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

টেগার্ট সাহেব আমার সহিত কথা সাঙ্গ করিয়া পকেট হইতে একটি ম্যাপ্ বাহির করিলেন। দেখিলাম—এই ম্যাপে যে গৃহে বোমা প্রস্তুত

হইত, সেই ঘরটির উপর একটি দাগ দেওয়া রহিয়াছে। টেগার্ট সাহেব ম্যাপ্ ধরিয়া সেই গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পমেজ সাহেবের পূর্ব্ব-সংবাদে আমরা জিনিষপত্র সবই সরাইয়া ফেলিয়াছিলাম। স্যার চার্লস টেগার্ট তন্ন-তন্ন করিয়া ঘরটী দেখিলেন। শেষে তিনি হাসিয়া বলিলেন "বোমার কারখানা এইখানেই প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে; কিন্তু নিশ্চয় আপনি পূর্ব্ব হইতে সংবাদ পাইয়া সবই সরাইয়াছেন। তবে এ ঘরে বোমা তৈয়ারী করার চিহ্ন আপনি মুছিতে পারেন নাই!" এই বলিয়া তিনি পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া দেওয়ালের একস্থান চাঁচিয়া বলিলেন "এইগুলি কি পিক্‌রিক্ এসিড তৈয়ারী করার যে ফিউম্, তাহার চিহ্ন নহে?" আমি হলুদের দাগ বলিয়া উড়াইয়া দিলাম। তিনি কিন্তু দেওয়াল হইতে অনেকখানি বালি চাঁচিয়া কাগজে মুড়িয়া পকেটস্থ করিলেন। ডিক্সন সাহেব বিষণ্ণ মুখে আসিয়া টেগার্ট সাহেবকে বলিলেন "কোথাও কিছু মিলিল না!" টেগার্ট সাহেব হাসিয়া বলিলেন "সকল বস্তুই সরান হইয়াছে, তবে বোমা-প্রস্তুতির স্থানটি সন্দর্শন করিলাম। তুমিও একবার ঘরটি দেখিয়া এস।"

ডিক্সন সাহেব ইঙ্গিত বুঝিয়া, ঘর দেখিতে প্রস্থান করিলেন।

ইত্যবসরে আমি বহু পুলিস-কর্ম্মচারীর সহিত টেগার্ট ও পমেজের নির্দ্দেশে রক্ষিত-দে-ঘোষ কোম্পানীর কাঠের গোলায় তাঁহাদের লইয়া গেলাম। টেগার্ট সাহেব ম্যাপ্ দেখিয়া চিহ্নিত স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এসিডের বোতল, প্যান্ ও বোমার খোল অপসৃত হইলেও, দীর্ঘদিনের অন্ধকারময় এ গৃহটি বোমার কারখানা হওয়ায়, টেগার্ট সাহেব টর্চের আলোয় মেঝের উপর পিকরিক্ এসিডের দাগ দেখাইয়া পুনরায় বলিলেন "আপনি যে বোমা নির্ম্মাণ করেন, এই সংবাদ পাইয়াই আপনাকে আমরা ধরিতে আসিয়াছি।" আমাদের পুলিস-কমিশনার

পমেজ সাহেব বলিলেন "আপনারা তখনই শ্রীযুক্ত রায়কে ধরিতে পারেন, যখন বৈপ্লবিক সামগ্রী পাইবেন ; তাহার অন্যথা হওয়ায়, তাঁহাকে আপনার হস্তে অর্পণ করা যায় না।" টেগার্ট সাহেবের সহিত পমেজ সাহেবের অনেক কথা-কাটাকাটি হইল। তারপর মিঃ টেগার্ট মঃ পমেজের অতর্কিতে আমায় ইঙ্গিতে জানাইলেন "আপনি কত টাকা এই পুলিসের পকেটে দিয়াছেন ?"

টেগার্ট সাহেব এক্সট্রাডিশান ওয়ারেণ্ট আনিয়াছিলেন। পণ্ডিচারীর গভর্ণর মসিয়েঁ মার্তিনো মঃ পমেজকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, যদি আমার নিকট বিপ্লব-সংক্রান্ত জিনিষ-পত্রাদি না পাওয়া যায়, আমাকে বৃটিশ পুলিসের হস্তে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। মসিয়েঁ পমেজ এইরূপ কথা যতই বলেন, টেগার্ট সাহেব কাগজের মোড়ক খুলিয়া, পিক্রিক্ এসিডের নিশানা প্রদর্শন করিয়া, ততই আমাকে গ্রেপ্তার করার দাবী করেন। অনেক তর্কাতর্কির পর মিঃ টেগার্ট এই ক্ষেত্রে পরিশেষে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যান। যাইবার সময়ে তাঁহার মুখ দিয়া দুইটি কথা বাহির হইয়াছিল, আজও তাহা স্মরণ করিয়া হাসিয়া আকুল হই।

বাণিজ্য-সৃষ্টির আদিতে 'রক্ষিত-দে-ঘোষ' কোম্পানী নামে কাঠের কারখানার প্রতিষ্ঠা হয়। 'আর-ডি-জি' বলিয়া আজও সর্ব্বত্র তাহার পরিচয়। টেগার্ট সাহেব খুব গম্ভীর স্বরেই বলিলেন "নামটি বেশ কায়দা করিয়া প্রচার করিয়াছেন। আপনি যে 'রেভোলিউশনারী ডিরেক্টর জেনারেল', তাহা এই নামেই প্রমাণিত হয় !"

তাঁহার দ্বিতীয় কথা 'আপনি রাসবিহারীর সহিত বিশেষভাবে সংযুক্ত হইয়া লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ করিয়াছেন— আপনার গলায় ফাঁসীর দড়ি যতদিন না পরাই, আপনি মনে রাখিবেন, ততদিন আমি অবিবাহিত থাকিব।" আজ ভাবি—কোথায় তুমি স্যার

চার্লস্ টেগার্ট ! আমার অনুরাগী ছাত্র রক্ষিত, দে, আর ভক্ত ঘোষকে লইয়া 'আর-ডি-জি কোম্পানী' সৃষ্টি করিয়াছিলাম, তোমার আবিষ্কৃত সরস ব্যাখ্যা আমি চিরদিন স্মরণে রাখিব ; কিন্তু তোমার ফাঁসীর দড়ি আজও আমার কণ্ঠনালী রুদ্ধ করে নাই। তোমার প্রতিশ্রুতি সংরক্ষিত যে হয় নাই, ইহা সকলেই বলিবে।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে এই টেগার্ট সাহেবই মহাত্মার নিকট আমার স্বীকারোক্তির সকল পরিচয় পাইয়াও আমায় ধৃত করেন নাই। সেদিন মিষ্টার টেগার্ট ডি-আই-জি নহেন ; পরন্তু কলিকাতার পুলিস-কমিশনার। পরে তাঁহার বিবাহও হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছি।

ফরাসী জাতির মসিয়েঁ পমেজ প্রমুখ যাঁহারা শিক্ষিত, তাঁহারা জাতির স্বাধীনতাকে কি চক্ষে দেখেন, তাহা আমাদের চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। কর্ম্মক্ষেত্রে বাংলার পুলিস ঘুষ খায়। পণ্ডিচারীর রেঁনসারাও ঘুষের কড়ি হজম করেন। কিন্তু ফরাসী জাতি মুক্তিসাধনার মর্ম্ম যথার্থ বুঝিয়াই চন্দননগরে ভারত-মুক্তিকামী আমাদের নিরাপত্তা-বিধানে অকুণ্ঠ নিঃস্বার্থ হৃদয়ে সেদিন আমাদিগকে সহায়তা করিয়াছিলেন। মসিয়েঁ পমেজের উপর আমার এই অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য সমগ্র ফরাসী জাতির প্রতি চিরকৃতজ্ঞতারূপেই গ্রহণীয়।

সংগঠনের পথে

শ্রীঅরবিন্দ বিপ্লবের দীক্ষা দিয়াও, তিনি আমায় বিপ্লবের মধ্যপথে 'হল্ট' অর্থাৎ থামিতে বলিয়াছিলেন। কানাইলাল সাহার অপকীর্ত্তি সেই নির্দ্দেশকে আরও দ্রুততর কার্য্যে পরিণত করিল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের শেষে শ্রীঅরবিন্দের আত্মসমর্পণ-মন্ত্র-গুরু বিষ্ণুভাস্কর লেলের মুখে বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল যে, বিপ্লবের মধ্য দিয়া ভারতের স্বাধীনতা আসিবে না, ভারত স্বাধীন হইবে যোগশক্তি-প্রভাবে, শ্রীঅরবিন্দও

সেদিন সে কথা শুনিয়াও বিপ্লবের পথ হইতে বিমুখ হইতে পারেন নাই। সেই একই বাণী ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্টের পর শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং উচ্চারণ করিলেন। ইহার দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাস হইতে আমি রক্তবিপ্লবের পথ ছাড়িয়া জাতির চরিত্রগঠনের পথেই অগ্রসর হইলাম। ঘটনাবৈচিত্র্য যেরূপই হউক, ভারতের মহাপুরুষ বলিয়া যাঁহাদের খ্যাতি, তাঁহাদের পথ অনুসরণ করিয়াই ভারতের মুক্তি আসিয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ চাহিয়াছিলেন সংগঠন। সে সংগঠনের ভিত্তিরচনা তেল-নুন-লেকড়ি নহে, পরন্তু মানুষের সবখানি উৎসর্গ করিয়া দিব্য-জন্মলাভ এবং এই উৎসর্গীকৃত মানুষ লইয়া সংহতি-সৃষ্টির উপর নির্ভর করে। আমি এই পথই শ্রেয়ঃ করিয়াছি। বিপ্লবযুগের কাহিনীতে যবনিকা ফেলিয়া তাই এই মন্ত্রই আজ উচ্চারণ করি—

"ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি—সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি"

পরিশিষ্ট

বিপ্লব-তীর্থ সঙ্ঘ-মন্দির

গণতন্ত্র সুরক্ষিত মুক্তিতীর্থ চন্দননগর।
দিব্যমাতৃস্নেহঘন সঙ্ঘপীঠ বিপ্লবে অমর ॥

সেদিন গোপনতীর্থে বিপ্লবের শুদ্ধ হোমশিখা
জ্বেলে' রেখেছিল যারা আত্মভোলা সাগ্নিকের দল
দুর্গম পথের যাত্রী শত-শত মুক্তির পাগল
বুকের পাঁজর চিরে' রাঙাইল আগুনের লিখা।
নিবিড় নিশীথ রাত্রে স্বজাতির ঘুমভাঙ্গা-ব্রতী
তারা নিয়ে' এল আলো, তারা দিয়ে গেল মহাপ্রাণ
জীবনের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে সুরু হ'ল নবীন আরতি,
শক্তিতন্ত্রে বেদান্তের মন্ত্রদীপ্ত যোগের উদ্গান।
হেথা স্মরণীয় তারা, বরণীয় তাহাদের দান—
জীবন-মরণে গাঁথা স্মৃতিপটে অক্ষয় অম্লান।

সমাগত বিপ্লবীদের নাম
(১৯০৮-১৯২০)

অরবিন্দ ঘোষ
বারীন্দ্রকুমার ঘোষ
উল্লাসকর দত্ত
নলিনীকান্ত গুপ্ত
বিজয়কুমার নাগ
সুরেশচন্দ্র দত্ত
কানাইলাল দত্ত
বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
মতিলাল রায়
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল
সৌরীন্দ্রমোহন বসু
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
চারুচন্দ্র রায়
রাসবিহারী বসু
শ্রীশচন্দ্র ঘোষ

নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
সত্যচরণ কর্ম্মকার
ননীলাল দে
নলিনচন্দ্র দত্ত
মাণিকলাল রক্ষিত
নটবর দাস
হারাধন বক্সী
ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
দীনবন্ধু দাস
যোগেন্দ্রনাথ শেঠ
সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত
জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
বসন্তকুমার বিশ্বাস
অতুলচন্দ্র ঘোষ
যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
(বাঘা যতীন)
বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়
নগেন্দ্রকুমার গুহরায়
মাখনলাল সেন
নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
(এম্-এন্-রায়)
অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী

আশুতোষ নিয়োগী
নির্ম্মলচন্দ্র বকসী
সাগরকালী ঘোষ
মণীন্দ্রনাথ নায়েক
অরুণচন্দ্র দত্ত
রামেশ্বর দে
দুর্গাদাস শেঠ
অরুণচন্দ্র সোম
জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ
ভূষণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
রূপলাল নন্দী
আশুতোষ দাস
পঞ্চানন সিংহ
ভূপতি মজুমদার
মন্মথকুমার বিশ্বাস
যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়
নলিনীকান্ত ঘোষ
প্রতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
সুদর্শন চট্টোপাধ্যায়
অমৃতলাল হাজরা
ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী
অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
নগেন্দ্রনাথ দত্ত

আশুতোষ কাহিলী	নলিনীকিশোর গুহ
হরিশচন্দ্র সিকদার	শ্রীশচন্দ্র সরকার
রবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত
প্রবোধচন্দ্র বিশ্বাস	প্রবোধচন্দ্র দাশগুপ্ত
রমেশচন্দ্র আচার্য্য	সীতানাথ দাস
সুশীলকুমার সেন	সুশীলকুমার লাহিড়ী
বাবুরাম পরারকর	শচীন্দ্রনাথ সান্ন্যাল
আউধ বিহারী	আমীর চাঁদ
প্রতাপ সিং	কর্ত্তার সিং
বালরাজ	বালমুকুন্দ্র
নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়	নরেশচন্দ্র সেন
যতীন্দ্রমোহন রক্ষিত	অমরনাথ রায়
সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	নরেন্দ্রনাথ সরকার
অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	রামচন্দ্র মজুমদার
অমৃতলাল সরকার	নরেন্দ্রমোহন সেন
বিনয়কৃষ্ণ দত্ত	লাড্‌লিমোহন মিত্র
জিতেশচন্দ্র লাহিড়ী	ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়
রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	চারুচন্দ্র রক্ষিত
নিত্যকেশী ঘোষ	বিনোদিনী ঘোষ

রাধারাণী রায় (সঙ্ঘজননী)

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক উন্মোচিত
৮ই আশ্বিন ১৩৬২, ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৫
[সঙ্ঘমন্দিরে রক্ষিত বিপ্লবীদের স্মৃতিফলক হইতে উদ্ধৃত।]